অঞ্জলি
১৪২৮
Anjali 2021
Durga Puja Magazine
Greater Binghamton Bengali Association

GBBA Puja

অঞ্জলি ১৪২৮

সূচীপত্র

অলঙ্করন

দীপা দাশগুপ্তা~~প্রচ্ছদ ও শেষের পাতার অঙ্কন (Front and Back Covers)
অনসূয়া দত্ত~~GBBA Puja(Inside cover page)
ভাস্বতী বিশ্বাস~~আলপনা ডিজাইন ও ফুলের অঙ্কন

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়~~ অঙ্কন (Inside back cover page)

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~~দেব দেবী, বাহন এবং প্রতিকের অঙ্কন

দীপা দাশগুপ্তা~~ (Communty Pictures) সংগ্রহণ

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~~ সম্পাদকীয়

কবিতা

কষ্ট তুমি তুচ্ছ ও মৃত্যুঞ্জয়ের গান: নুপুর রায়চৌধুরী~~1

প্রাচীন নিসর্গরেখা অনুবাদ: স্বপন ভট্টাচার্য~~2-3

উত্তরণ: অঞ্জলি দাশ~~4

অদৃশ্য চাঁদ, নেতিবাচক নয় ইতিবাচক, রাখালের ঘুড়ি, ও রিরংসা: বাসব রায়~~5-6

কবিতা

স্রোতকথা: সুবীর বোস~~7

অনতিক্রম্য ও হলুদ ট্রাম: আর্যা ভট্টাচার্য~~৪

ইরাবতী ও ব্যাথা: রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়~~9

অনতিক্রম্য ও হলুদ ট্রাম: আর্যা ভট্টাচার্য~~৪

ইরাবতী ও ব্যাথা: রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়~~9

না-পাঠানো চিঠিগুলো(সম্পাদকের প্রতি, বছরের শেষ চিঠি জুকারবার্গকে, ও প্রিয় কবিকে): ঝর্না বিশ্বাস~~10-11

সুজাতা তোমার পায়ে: সুজিত বসু~~12

ঢং: লুনা রাহনুমা~~13

রাত-পাখি: দেবাশিস গোস্বামী~~14

ওরে মেয়ে: সৌমি জানা~~15

আগমনী: দেবায়ন চৌধুরী~~16

চতুষ্পদী পদ্য: আশিস মুখার্জী~~17-18

প্রবন্ধ

এক উদাসী বাউল...:অনসূয়া দত্ত~~34-37

ভ্রমন

অন্য কেরালা: তাপস সরকার~~75-85

গল্প

একটি গান ও লুকিয়ে থাকা ইতিহাস: দিলীপ হরি~~38-39

সবুজ রঙের ডায়েরি: পায়েল চ্যাটার্জি~~40-42

মোদির ভালোবাসা: অনুপম লাহিড়ী~~43

শিউলির ঘ্রাণ: অনন্যা দাশ~~44-46

কুষ্ঠি বিচার।: সুদীপ সরকার~~47-51

প্রতিপালন: উস্রি দে~~52-55

ঢং: মলয় সরকার~~56-59

মেঘ সরিয়ে: চৈতালি সরকার~~60-62

গ্রামের নাম শিয়ালমারি: সজল কুমার মাইতি~~63-64

অমৃত: হীরক সেনগুপ্ত~~65-70

সোনালী রিদিম: ড. সাধন কুমার পাত্র~~71-74

স্মৃতিকথা

মায়ের খাতা: ভারতী মুখার্জি~~86-93

Children's Corner

Rudranshu Das~~19
Arna Saha~~20
Amritakshi Sanyal~~21-22
Meenakshi Chakravadhanula~~23-24
Ella Bagchi~~25
Alice Bhawal~~26-27
Sriram Chakravadhanula~~28-30
Gavriie Singh~~31-32
Arpan Dasgupta~~33

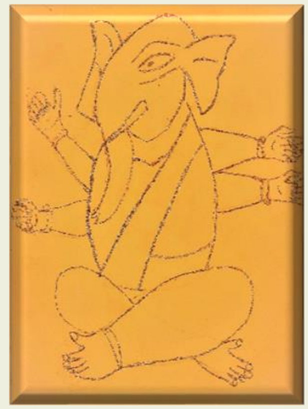

English Section

Every Night I Stand Alone: Paramartha Bandyopadhyay~~100
Headgear: Arnab Dasgupta~~101-104
Unique culture of south-Gullah Geechee: Vaswati Biswas~~105-110
Alzheimer's Disease, its Progression, and Photographs: Archana Susarla~~111-113
Foundation stones: Sushma Madduri~~114-116

Amazing Alaska: Asish Mukherjee~~117-126

Art

Sheema Roychowdhury: Photography~~94-95

Rajarshi Chattopadhyay: Painting & Drawing~~96

Vaswati Biswas: Alpana Drawing~~97

Amrita Banerjee: Paintings~~98

Pradipta Chatterji: Paintings~~99

Community Pictures

Community Pictures

কষ্ট তুমি তুচ্ছ

নুপুর রায়চৌধুরী

পাথরচাপা কষ্ট হতে পারে
জীবনজয়ী সৃষ্টির আঁতুড়ঘর
সৃষ্টির দিকভাসানো উল্লাসে
ভেসে যায় কষ্টের তান্ডব
অস্তিত্ব টুকু টিকিয়ে রাখার প্রবল হিংসায়
কষ্টগুলো তবু জ্বলে
আনাচে কানাচে
সেই জ্বলনে কেবল আঁচ লাগে চামড়ায়
অন্তরাত্মার অপমান করে
এমন সাধ্য কি সে দহনের?

নুপুর রায়চৌধুরী, জন্ম, পড়াশুনো দেশে। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করেছেন। লেখালিখির নেশা, মিশিগানের বাসিন্দা।

মৃত্যুঞ্জয়ের গান

নুপুর রায়চৌধুরী

মৃত্যু তুমি না কি ঘোর নিশ্চিত?
কিন্তু যে কর্মনেশার,
উন্মাদনায় জাগ্রত,
ওই আশ্চর্য সুন্দর প্রাণশক্তি,
তাকে ক্ষীণবল করো,
এমন সাধ্য তোমার কৈ?
জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে,
পাথর করে রাখবে অহর্নিশ?
ছাড়ো এই মতলব!
মৃত্যুঞ্জয়ের গান আমাদের কণ্ঠে,
সৃষ্টির উল্লাস আমাদের কলিজায়,
রক্তে নাচে নটরাজের মাভৈ।
মরে যেতে যেতেও,
জ্বেলে যাই আমরা,
আগুনের দু এক ফুলকি।
হতে পারে অতি ক্ষুদ্র
কিন্তু ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাই
এক থেকে হয় বহু
মৃত্যু তুমি এখন পরাভূত।
সরিয়ে নাও ওই,
মিথ্যা কালো হাত।
দেখতে পাও না?
দুয়ারে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে,
উছলানো আলোর জীবনতৃষ্ণা।
যেমন রমণীয়,
তেমনই সত্য সে পরম।

প্রাচীন নিসর্গরেখা

২০২০ তে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়া আমেরিকান কবি লাওজি গ্লাক-এর কবিতার অনুবাদ।

অনুবাদ: স্বপন ভট্টাচার্য

(মূল Aboriginal Landscape by LOUSIE GLUCK)

বাবার গায়ের উপর পা তুলে দিলি, মা বলল
এবং সত্যিই আমি একফালি ঘাসের বিছানার
একেবারে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এত সুন্দর নিড়ানো,
হতেই পারে বাবার কবর
যদিও কোন পাথরের গায়ে সেটা লেখা ছিল না।

বাবার গায়ের উপর পা তুলে দিলি, মা আবার বলল
আরও জোরে, অবাক লাগতে শুরু করল এবার
কেননা মা'ও তো কবেই মরে গেছে, এমন কি
ডাক্তারও সেরকমই মেনে নিয়েছিল।

একটু সরে দাঁড়াই আমি, সেইখানে
যেখানে আমার বাবা শেষ, আর মা শুরু করেছিল।

সেমেটারি নিস্তব্ধ । গাছগুলোর ভিতর দিয়ে
হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে
কয়েক সারি দূরে কেউ একটা কাঁদছে, তারও ওপার
থেকে
শুধুমাত্র কুকুরের বিলাপ ।

দূরে চলে এলে এসব আওয়াজ মরে যায়।
মনে হয় সেখানে টেনে নিয়ে যাবে,
এমন কোন স্মৃতি নেই আমার,
মনের ভিতর যাকে সমাধিক্ষেত্র বলে মনে হয়েছিল
আসলে হয়ত তা একটা পার্কগোছের হবে,
আর পার্ক যদি না'ও হয়ে থাকে
একটা উদ্যান অথবা বাগানবাড়ি, সুবাসিত
গোলাপের ঘ্রান, বোঝা যায়, যেমন কথায় বলে
বাধাবন্ধহীন মুক্তি,
জীবনের মাধুর্যগুলি বাতাসের গায়ে মিশে
আছে। এক সময়
মনে হতে থাকে একা আমি
বাকিরা কোথায় গেল
আমার যে তুতো ভাই আর আমার বোন
ক্যাটলেইন ও অ্যাবিগেইল?

ইতিমধ্যে আলো মরে আসছিলো। গাড়িটা কোথায়
যেটায় আমরা সব বাড়ি ফিরে যাবো কথা ছিল ?

একটা বিকল্প খুঁজতে শুরু করি আমি।
একটা অস্থিরতা আমার ভিতরে, ক্রমশ দুশ্চিন্তায়
পরিণত হচ্ছে বলা যায়।
অবশেষে, দূরে একটা ছোট রেলগাড়ি,
দাঁড়িয়েছে, মনে হয়, ঝোপটার আড়ালে কোথাও,
গার্ডসাহেব
বগির দরজাটায় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আয়েসে হেলান।

আমাকে ভুলো না, আমি চিৎকার করে বলি, দৌড়াই
অগণিত কবরের উপর দিয়ে, অসংখ্য বাবা আর
মায়ের-

আমাকে ভুলো না যেন, চিৎকার করি, অবশেষে
ধরে ফেলি তাকে।
ম্যাডাম, লাইন দেখিয়ে সে বলে
বুঝতেই পারছো এখানেই শেষ
এ লাইন এগিয়ে আর যায় নি কোথাও।
ভাষাটা খানিক রূঢ়, চোখ তার তথাপি দয়ার
সুতরাং, আর একটু জোর দিয়ে নিজের কথাটা বলিঃ
কিন্তু এরা তো সেই ফিরেই যায়, আমি বলি, এবং
কঠিন ও দৃঢ়ভাবেই বলি মনে হয়, হয়তো বা
আরো বহুবার ফিরে যেতে হবেই তাদের।

তুমি জানো, সে বলে ওঠে, আমাদের কাজটা
কঠিনঃ আমরা
অনেক দুঃখ আর হতাশাকে কাছ থেকে দেখি।
ক্রমে ক্রমে খোলামেলা সহজ নজর তার ।
একসময় তোমারই মত ছিলাম, প্রেমে ও সংশয়ে,
সে বলে ওঠে।

এতক্ষণে সে পুরনো বান্ধব হয়ে গেছে, তাকে আমি
বলিঃ
তোমার খবর? যেহেতু সে মুক্ত আর ফিরতে
সক্ষম,
তাই আমি বলি, তোমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
না বাড়ি,
পুনরায় দেখে নিতে পুরনো শহর?

এই আমার ঘর, সে বলে।
শহর- শহর সেটাই, যেখানে অনায়াসে স্রেফ উবে
যেতে পারি।

স্বপন ভট্টাচার্য কলকাতানিবাসী অবসরপ্রাপ্ত মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক। আশির দশক থেকে কবিতা ছোটগল্প ও নাটক লিখছেন। এক সময় সম্পাদনা করতেন ঋত্বিক নামের ছোট পত্রিকা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগদ্য লিখছেন অনেকদিন ধরেই।
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুটিঃ ওষধিবাগান (তৃতীয় পরিসর,২০১৮) এবং গ্যালিয়ানোর আয়না ও অন্যান্য কবিতা (কলমচি, ২০১৯)। প্রকাশের মুখে বিজ্ঞানগদ্য সংকলন 'অবিহিত কাল'(তৃতীয় পরিসর)। তাঁর লোরকার কবিতার অনুবাদ সিরিজ প্রকাশিত হচ্ছে পরবাস পত্রিকায় ।

উত্তরণ

অঞ্জলি দাশ

ঠিক জানি একদিন পেরিয়ে যাবোই মানবিক কলঙ্ককাহিনী...
এই বিষ, করাতের দাঁত।
কারণ আমরা তো বৃক্ষশিশুকে জন্ম দিয়েছি বারবার
কারণ আমরা তো গাছের শিকড় ছেড়ে এক পা-ও এগোতে পারিনি একা
কারণ আমরাই আকাশ দখল করে
ছড়িয়ে দিয়েছি ডালপালা, সন্তান সন্ততি।

করাত না বিষ? কোনটা বেশি ঘাতসহ?
প্রথম আঘাতে আমি ব্যথা দিয়ে প্রত্যাঘাত করি,
অন্তঃস্থল কেঁপে ওঠে দ্বিতীয়তে,
পাতায় পাতায় মর্মরের ভাঁজে ভাঁজে মৃত্যু-গান বাজে
বৃন্ত ঝরে, সঙ্গে পরাগ রেণু,
তারা শিকড়েই ফেরে বার বার।

অঞ্জলি দাশ মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। কিশোর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চার শুরু কবিতা দিয়ে হলেও পরবর্তীতে কবিতার পাশাপাশি সমান দক্ষতায় গল্প এবং উপন্যাস রচনা শুরু করেন । দেশ, আনন্দবাজার, সানন্দা ও আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তার গল্প প্রকাশিত ও বিশেষভাবে প্রশংসিত ।এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন। ‘জেব্রাক্রসিং’ নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (১৯৭৮ -১৯৮১ পর্যন্ত)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ পরীর জীবন(১৯৯১), চিরহরিতের বিষ (১৯৯৯), এই মাস নিশ্চুপ তাঁতের (২০০১) , সহজে বোঝো না (২০০৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০৯)মুগ্ধ হয়ে থাকি (২০১৭),হৃদয়ের বোন প্রকাশিত গল্প সংকলনঃ এক প্রজাপতি ও বৃক্ষলতা প্রকাশিতব্য - পরীবাগান (উপন্যাস)।

অদৃশ্য চাঁদ

বাসব রায়

এতকাল একটা ঘুটঘুটে অন্ধ চোখে পৃথিবীকে দেখেছি –
কৃষ্ণগহ্বর থেকে আসা আমি নতুন আগন্তুক

পৃথিবীর বড় আবিষ্কার তেলের ঘানি
বলদ ঠুলি চোখে বৃত্তাকারে অনবরত হাঁটছে
বিষয়বস্তুর কিছুই সে জানে না ।

কোন ঠুলি ছাড়াই অনেকে দেখতে পায় না
লালকে কালো দেখে কিংবা হলুদকে ধূসর

বুকপাঁজরে জমাট বেঁধেছে মহাকালের দ্বন্দ্ব
সে সকাল দেখে না, দেখে না মিষ্টি বিকেল
সে শুধু রাত দেখে যেখানে চাঁদের দেখা মিলেনি হাজার বছর

বাসব রায় বেসরকারি হাইস্কুল শিক্ষক, লেখালেখির সাথে জড়িত ।

নেতিবাচক নয় ইতিবাচক

বাসব রায়

একটা আংশিক ছোবলে নেতিবাচক ভাবনারা দোদুল্যমান
ভাবনাগুলো নতুন করে আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করে

আমি ইতিবাচক হতে বলি
একদম সোজা এবং দৃঢ়
প্রচণ্ড ঝড়ও যেখানে লেজগুটিয়ে পালায়

বিচ্ছেদের সেতার সে বাজবেই
ধরে নিয়ো সবটুকু প্রেম সেখানেই জমা

বাঁশিতে যমুনার ঢেউ তুলো, দেখবে তীরে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে শাহজাহান – ।

রাখালের ঘুড়ি

বাসব রায়

একটা সুতোছেঁড়া ঘুড়ি আকাশকে
সহজেই পেয়ে যায়
মাঠের রাখাল আকাশ চায় না
ঘুড়িটাকে চায়

ঘুড়িটা মিলিয়ে যায় মেঘ আর নীলে
হয়তো ওখানেই সে তার ঠিকানা গড়ে

বর্ণিল ঘুড়িটাকে হারিয়ে
রাখাল আকাশের দখল নিতে চায়
ওর ডানা নেই বাতাসে উড়োনোর –।

আবার নতুন একটা ঘুড়ি বানাতে বসে
কঞ্চির আঁঠায় রঙিন কাগজ দিয়ে
ঘুড়ি হয়, লাটাইয়ে সুতো ভরে
সারাদিন ঘুড়ি উড়োয় – ।

রিরংসা

বাসব রায়

বর্ষায়ও আগুন জ্বলে
অন্তর- বাহির সবখানে
খুব কাছেই পিপাসা অপেক্ষায়
রাতের আগুন আরও জ্বালা ধারায় ।

আত্মবিস্মৃত হই
রক্তের কণায় কণায় আস্ফালন
প্রজ্বলিত আকাঙ্ক্ষায়
কামনার দহন ।

নিজেকে ডোবাই
নিজেকে হারাই
ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করি –
মরেও মরার সাধ জাগে আবার ।

স্রোতকথা
সুবীর বোস

স্রোতের উপরে গড়িয়ে গেল তোর আঙুলের ছোঁয়া
নদী হল উতল ধারা বাউল হল জোয়ার

সে কী সটান স্রোতকথা সব রুমাল-রুমাল খেলা
ঢেউয়েরা সব আদর খুঁড়ে কাটিয়ে দিল বেলা
প্রেক্ষাপটে আকাশ ছিল কুসুম কুসুম জলে

আমিও ছিলাম, পাঁজরপুরাণ, সেই প্রকৃতির দলে
কোন শর্তে স্রোত ও জলে আঙুল ডোবাস তুই
কোন শর্তে ভ্রুক্ষেপহীন একটু যদি ছুঁই
এ সব ভেবে দিন গুনিনি – তুই তো পুণ্যতোয়া

স্রোতেই থাকুক সংস্থিতা তোর আঙুলের ছোঁয়া।

সুবীর বোস: সময় পেলে কিছু লেখালিখির চেষ্টা করি। কিছু ছাপা হয় – কিছু চাপা পড়ে থাকে আমার কম্পিউটারে এবং সময়ে-সময়ে তারা হারিয়েও যায়।

কবিতা যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে –
দেশ, কৃত্তিবাস, কৌরব, পরবাস, কবি সম্মেলন ইত্যাদি;
গল্প যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে – দেশ, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, আনন্দমেলা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, শুকতারা , পরবাস ইত্যাদি;
ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে পরবাস এবং অবসর ওয়েব ম্যাগাজিনে।

অনতিক্রম্য

আর্যা ভট্টাচার্য

'আর একটু...শুধু একটু'-..যাকে বলা হয়-তেমনই অনতিক্রম্য এক দূরত্বের প্রান্তে বসে আছি, আকূল প্রার্থনা নিয়ে তোমাকে ছোঁবার। খাঁচার অচিন পাখি আকাশকে চেয়ে শুধু,যেমন নিষ্ফলকাম ডানা ঝাপটায়-লোহার বাঁধনে ক্ষুব্ধ – দীর্ণ হতে হতে।

সাগরের ঢেউ ছোঁওয়া আশ্চর্য বাতাস হঠাৎ কখনো বয়ে যায়।সে বাতাস সিক্ত স্নিগ্ধ তোমার কান্নায়।যে কান্না আনছে বয়ে তোমার প্রার্থনা-যে প্রার্থনা উচ্চারণ করছো তুমি আমাকে চেয়েই; 'আর একটু শুধু'....-যাকে বলা হয়,তেমনই অনতিক্রম্য এক দূরত্বের সীমায় দাঁড়িয়ে।

দর্শনের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়া, সাহিত্য, ভ্রমণ ও ভাষা শেখার আগ্রহ রয়েছে আর্য্যা ভট্টাচার্যের। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ' পরবাস' । তার লেখা কবিতা ও ছোটোগল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

হলুদ ট্রাম

আর্যা ভট্টাচার্য

বৃষ্টি নেমেছে । সন্ধ্যে অনেক দূর। ট্রামে করে চলো ভেসে চলে যাই । ভেসে যাই আসি, বিরহের খেয়া ভাসাক ডোবাক। হাতের পাতায় থাকুক অন্য হাত।

বৃষ্টি বাড়ছে। ঝরে পড়া মল্লার। ট্রাম ছেয়ে তবু সূর্যমুখীর ফুল। খুঁজছে তিয়াসে বুকের বসন্তকে। শিহরণ সুখ দুহাতে ঢেকেছে, জানালার গাঢ় কাঁচ।

বৃষ্টি যাচ্ছে-অনেক দূরের পথ। নর্তনশীল বেতস, গুলঞ্চ। ময়দানে সে কী অঙ্কুর সমারোহ। ছত্রি বিহীন রাজপথে ভেজে স্মৃতির দমকা রেশ।

তোমার বাড়িতে তেমন বর্ষা কই? ভেজেনা দরজা, দুয়ার, কপাট , খিল।শিরার মতন দাগগুলি দিয়ে জল ঝরে যায় , একা একা শুধু আনমনে ঝরে। ঝরেই হারায়।

বর্ষায় এসো,ধর্মতলায়। ট্রাম এসে গেছে বৃষ্টিতে ভিজে।জানলার পাশে জায়গা রয়েছে।অপেক্ষা তার সাথে।

ইরাবতী

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

ইরাবতী ইরাবতী তোমায় দেখব বলে,

দাঁড়িয়ে ছিলাম ছুটির পরে শালপিয়ালের কোলে।
ইরাবতী তখন তুমি প্রথম ধরেছ শাড়ি,

দিনে দিনে হচ্ছো তুমি বালিকা থেকে নারী।।
গ্রীষ্ম পুজোর ছুটির মাঝে তোমার দেখা কই?

একবারটি দেখব বলে অপেক্ষাতেই রই।
দাঁড়িয়ে থাকি দেখব বলে কাজল নয়ণখানি,
মিছি মিছি স্বপ্ন দেখি জানি আমি জানি।।
তবু কি তুমি আমাকে দেখেও দেখো নাকি?
দিবাস্বপ্ন দেখে আমি তোমার আশায় থাকি।
মন মানে না স্বপ্ন গুলো অলীক দৃশ্যে ভরা,
রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে আমার তোমার সাথে ঘর করা।।

একদিন হঠাৎ দেখি—
তুমি চলে গেছ একা।
স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি,

আজ লাগছে ভীষণ ফাঁকা।।

ব্যাথা

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

কিছু গুমরে থাকা ব্যাথা
ফিরে ফিরে আসে জীবনের ফাঁকে
কিছু না বলা কথা মনের কোনে গুম ঘরে থাকে
কিছু আচমকা কথা
হাতুড়ি মারে বুকে
কিছু চাপা কান্না মুক্তির আকাশ খোঁজে
না পেয়ে গুমরে মরে দেয়ালের ভাঁজে
কিছু ক্ষতি পূরণ হয় না বুকে
কিছু ব্যাথা দহন হয়ে বেঁচে থাকে

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী. গভঃ কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফট কলকাতা, থেকে 1996 এ স্নাতক. বর্তমান এ কনটেম্পোরারি ফাইন আর্টিস্ট এন্ড রাইটার. গল্প ও কবিতা লেখেন. দেশে বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকা তে ছবি ও লেখা প্রকাশ হয়েছে. ইন্ডিয়া তে বহু প্রদর্শনী তে অংশ গ্রহণ করেছেন ।

না-পাঠানো চিঠিগুলো

ঝর্না বিশ্বাস

সম্পাদকের প্রতি

আপনার “শেষ তারিখ” পোস্ট দেখেই মনে হলো এইবার কিছু লেখা দরকার। তাই টেবিল টেনে, চেয়ার ঘুরিয়ে বসে সেখানে দেওয়া প্রতিটা বার্তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম ও শব্দসংখ্যা থেকে চোখ নামাতেই নজরে পড়ল বিভাগগুলোতে – ওতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ আরো কত কী...

বেশ দ্বন্দ্বে ছিলাম কিছুক্ষণ...কী লিখি, কী লিখি, তারপর চশমা নামিয়ে নিতেই দেখি আমার হাফ হাফ লেখাগুলো কোনটা পুঁইচারা আবার কোনটা কুমড়ো চারার মত মাথা উঁচু করতে চাইছে।

আজকাল আস্কারা দেইনা ওদের - জল ও সময় তো একেবারেই হয়না। তবুও আষ্টেপৃষ্ঠে ওরা আমায় জড়িয়ে সারাক্ষণ। তাই এমন বার্তা পেলে আবারও লিখতে ইচ্ছে হয়। কী-বোর্ডের কিলিবিলির সাথে হার্টবিটের তুমুল হাড়ুডু লিখিয়ে নেয় অল্প কটা লাইন...যদিও জানি তার অনেকগুলোই না বাছা হয়ে পড়ে থাকবে আপনার অমূল্য ফাইলের কোনও অন্ধকার খাঁজে।

সম্পাদকের টেবিল যেন এক পৃথিবী, ওতে স্থান পাওয়া, না-পাওয়ার অভিমান একেবারেই নেই, তবে আবদার আছে – ভালো লেখা হোক, লেখা হোক...ও ঝুপ্পুস করে দরজা খুলে যাক সমস্ত বন্ধ ঘরের।

ঝর্না বিশ্বাস: জন্ম ও পড়াশোনা কলকাতায়। গণিতে স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। বর্তমানে মুম্বাই প্রবাসী। গল্প ও কবিতা পড়তে ভালোবাসি আর সেই সূত্রে লেখালেখিও করি কিছু বাংলা পত্রিকায়।

বছরের শেষ চিঠি জুকারবার্গকে

ঝর্না বিশ্বাস

বছরটা এলো মার্ক, তবে ভালো গেল না। কোভিড উনিশ এসে কুড়ি-কুড়িকে ঝাঁঝরা করে দিল। তবে তোমায় ধন্যবাদ দেবার জন্য এ চিঠি...

গত ক-মাস ঘরবন্দী মানুষগুলোতে অল্প হলেও মনখারাপ কাটিয়েছ তুমি। তোমার মুখবই যেন এক পরিবার। বিশাল সেই বাড়িতে চিলেকোঠার বারান্দায় গল্প হয়, কবিতা হয় আবার খোলা ছাদের মত এতে মুক্তির আশ্বাস।

যদিও কিছু ভালোলাগা সবার নিজস্ব, তবু কথা হয় চেনা ও অচেনায়। আবার ভালো থাকারও অনেকগুলো পরত আছে, তার প্রত্যেকটায় না গিয়ে আজ খুব সহজ করে বলি,

তুমি ছিলে তাই হু হু করে কেটে গেল সকল বেলা। আবারও হৈ চৈ চতুর্দিকে। তবে এ বছর আর কোনও হুটোপুটি নেই...আগে থেকেই গুটিয়ে নিয়েছি আমি।

প্রিয় কবিকে

ঝর্না বিশ্বাস

কাল রাতেই আপনার কবিতা পড়ে গেছি

বাইরে তখন হালকা শীত

ঘরের জানালাটা বন্ধ রেখে মোবাইলে হাত দিতেই

এলো নোটিফিকেশন।

দেখলাম, ভার্চুয়াল পাতায় আপনার নামটি

জ্বলজ্বল করছে,

আর আমার আগে ভালোলাগা জানানো

তেইশটি আঙুলের ছাপে, লাইকও কেমন আকাশী নীল।

ঠিক এই সময়টায় আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম

ইচ্ছে ছিল জিজ্ঞেস করব -

মন্তব্য প্রকাশে যত গোলাপী ধক্‌ধক্‌

তাঁরা একজনও আপনার

প্রেরণা বসু হতে পেরেছে!

z

সুজাতা তোমার পায়ে

সুজিত বসু

আগুনের গোলা ধরে উত্তাপে পুড়েছে আমার হাত
তুষারে গিয়েছি জুড়োতে সে জ্বালা, সেই হাত জমে শীতে
বাগান করার স্বপ্নে কেটেছে কত বিনিদ্র রাত
সুজাতা আমার ঘর আজ ভরা কাঁটালতা উদ্ভিদে

বলো নি মাটিতে কি রত্ন ছিল, বহুদিন ধরে খুঁড়ছি
পাতালে নামার গর্ত গভীর, হঠাৎ বেরোয় সিন্দুক
ভিতরে রয়েছে ছলনায় ক্রূর সাপিনীর প্রতিমূর্তি
ভালোবাসা যদি বলো একে তুমি বিশ্বের সেরা মিথ্যুক

আমার চোখের মণি নয় প্রেম প্রতীকের নীল পদ্ম
অনেক সয়েছে ঘৃণা বিদ্যুৎ, আজ দিতে পারি উপড়ে
কলঙ্কী শিরা উপশিরাগুলো অভিমান মদে মত্ত
অনেক হয়েছে, আমি মরে গেলে জমা করে দিও লুভরে

তুবড়ির খোলে আগুনের কত স্ফুলিঙ্গ কণা বিন্দু
নিভৃতে ছিল, কত মিলিয়ন মেগাওয়াটের শক্তি
দেহের প্রতিটি রক্তকণায় তোমার জন্য, কিন্তু
তুমি তা নিলে না, পরমাণু ফেটে শরীরে রক্তারক্তি

শতচ্ছিন্ন শরীর নিয়েও বেঁচে আজও কেন আছি
অগ্নিকুন্ড সমুখে আমার, তাতে শুধু ঘৃতাহুতি
দিলেই শান্তি জ্বালা বেদনার, কেউ নেই কাছাকাছি
দূর থেকে শুধু অপমান ধুলো ছুঁড়ে দিও এক মুঠি

গোধূলির এই অবেলায় আমি জীবনকে বহুবার
বলেছি তাসের ঘর ভেঙে গেছে, তোমার এ হরতন
রাজা বিকোবে না এই দুর্দিনে, সুজাতা তবু তোমার
পায়ে নতজানু হয়ে বসে আছে অবাধ্য এ জীবন।

সুজিত বসু ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় দীর্ঘ বিজ্ঞান সাধনার পর এখন অবসরে।দেশের এবং আমেরিকা সহ বিদেশের বহু প্রথম সারির পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত। তবে বিজ্ঞান যদি তাঁর পেশা হয়ে থাকে তবে কবিতা তাঁর নেশা এবং অন্যতম ভালোবাসা। পরবাস এবং অন্য অনেক পত্রিকায় লিখেছেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পড়শিতেও অনেক বছর আগে বেশ কয়েকবার লিখেছেন।

ঢং!

লুনা রাহনুমা

নক্ষত্রপুঞ্জের বিন্দু বিন্দু ঘাম
আর রজনীর আঁচল নিংড়ানো প্রেমাংশুরা

কথা কয়ে উঠে।
অবিকল তোমার গলার স্বর নকল করতে জানে দেখছি
ওরা!
বারান্দার ময়না পাখিটাও সুর করে গান ধরে,
প্রশ্রয় চায়,
কাতর হয়ে বলে: এসো কাছে –
শব্দের আকুল মিনতির মতন অশ্রুধারায়
জল হয়ে গলে যাই আমি,
উনুনের তাতানো আগুনে
তুলতুলে রুমালি রুটির মতো-

ফুলে ফেঁপে একাকার হয় আমার বিহ্বলতা।
ইশ,
মোহাচ্ছন্নতার এই বলয় ভেঙে সত্যি যদি কাছে পেতাম!
ইশ,
দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোটানা ছন্দের দুলকি চালে সত্যি যদি তুমি
আমার হতে!
কানের কাছে আবার বাজে সেই পরিচিত স্বর,
গমগমে ভারী

গভীর ভীষণ।
তাচ্ছিল্য নাকি প্রেম?
বুঝিনি পুরোপুরি,
শব্দটা শুনেছি কেবল – খুব পরিষ্কার উচ্চারণ:
ঢং!

লুনা রাহনুমা, জন্ম ও বেড়ে উঠা বাংলাদেশে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের সুইন্ডনে বসবাস। কলেজ জীবনে লেখালেখির জগতে প্রবেশ। দুই বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন ও ওয়েবজিনে লিখছেন গল্প, কবিতা, অনুবাদ। বই পড়া ও কবিতা শোনা প্রিয় অভ্যাস। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুইটি। কর্মজীবনে পে-রোল একাউন্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

রাত-পাখি

দেবাশিস গোস্বামী

উদ্ধত কাঁটার ওপর বুক চেপে
যে পাখি সারা রাত জাগে
জ্যোৎস্নায় লোহিতকণা মিশিয়ে দেয়
আর ওম দেয় একটি আফোটা কুঁড়িকে
ভোরের আলোয় চোখ মেলতে
দেখবে বলে
কোনো দেমাকি রাজকন্যে
বা প্রেমাতুর রাজপুত্রের জন্যে নয়

নিজের সমস্ত স্বপ্ন আর প্রাণের
লোহিত নির্যাস ঢেলে
রাতের প্রশাখায়
একটি রক্তগোলাপ
ফুটিয়ে তুলবে বলে

দেবাশিস গোস্বামী পেশায় গণিতের অধ্যাপক, কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এ কর্মরত। অবসর সময়ে অল্পস্বল্প লেখালিখি, ছবি আঁকা ও তবলা চর্চা করে থাকেন। কৈশোর থেকে এ যাবৎ কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার চেষ্টা করেছেন, কবিতা ও অন্যান্য ধরণের বেশ কিছু লেখাপত্র ইতস্তত লিটল ম্যাগাজিনে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

ওরে মেয়ে

সৌমি জানা

একটা কেশজাল পেরিয়ে আর একটায় পদার্পণ
সঙ্গে সঞ্চয় ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকা
একঘেঁয়ে অন্তঃপুরীয় টানাপোড়েন
চোখের কোলের সরু কাজলরেখা
অশ্রুভারে ধেবড়ে মাখামাখি
কলঙ্কভাগীর আরশি আশ্চর্য্য চুপ
শুধু কান পাতলে আড়ালে ফিসফিসানি
কপালের টিপখানি তবু উদ্ধত জ্বলজ্বলে
ছোটবেলা থেকে রাজকন্যে সুয়োরানী দুয়োরানী
খেলে খেলে ক্লান্ত হতোদ্যম ।
ওরে মেয়ে পালা এবার
রাজপ্রাসাদের অন্ধকূপে মাথা খুঁড়ে
মরিস নি আর!
ওই কপালের জ্বলজ্বলে টিপখানি
হোক তোর পথ প্রদর্শক ধ্রুবতারা
এবার খুঁজে নে একচিলতে নিজস্ব আকাশ
ডানা মেলে উড়ে যা যেদিকে দৃষ্টি যায়
খুলে দে সবলে যাবতীয় আরোপিত বাঁধন
একবারও ভুলিস না যেন
আজ তুই স্বাধীন , শর্তহীন , স্বেচ্ছামতী ।

সৌমি জানা নিউ জার্সির বাসিন্দা। কর্মসূত্রে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত। লেখালিখি ছাড়াও বাচিক শিল্প ও নাটকের চর্চা করেন। বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নিয়মিত। ছোটদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বিশেষ ভালোবাসেন। সৌমির পরিচালিত "রতনগড়ের রতনজোড় " নামক অন্তর্জালে ছোটদের নাটক সম্প্রতি বহু প্রশংসিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন , ২০২১ এ প্রদর্শিত ' সৃজনে সৃজিত ' অনুষ্ঠানে সৌমির আবৃত্তি ও ভাষ্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

আগমনী
দেবায়ন চৌধুরী

জানলা খুলেই তুমুল আকাশ
ম্যাটাডরে মেঘ চলে যায়
তোমার জন্যে শিউলি ঢাকা
গলির মুখে ভোরকে নামায়

শিশির ছুঁয়ে রোদের আদর
আগমনী তোমার বাসা
কাশের নদী আকাশ আঁকে
এমনি করে কেই বা ভাসায়

মুখোশ পরা ঠোঁটের তিলে
অন্ত্যমিলে স্পর্শ হাওয়া
এই তো কেমন বেঁচে আছি
মারির দেশে তোমায় চাওয়া!

দেবায়ন চৌধুরী পেশা- অধ্যাপনা।
কাব্যগ্রন্থ- *যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।*
গদ্যের বই- *হরেক মাল* ।

চতুষ্পদী পদ্য

আশিস মুখার্জী

উর্দু শায়রীর আদলে কিছু চার লাইনের বাংলা পদ্য লেখার চেষ্টা। এতে শায়রীর মেজাজ আসেনা, কিন্তু বড় কবিতার চিন্তাবিন্যাসের প্রয়োজন না থাকাতে, তাৎক্ষণিক অনুভূতি নিবিড় ভাবে প্রকাশ করা যায় ।

আনাড়ি হাতের কিছু অসংলগ্ন নিবেদন:

অতীতের ডাক

বহু আলোকবর্ষ পার করে, এনেছো বুঝি উপহার?
সময়ের সলিল সমাধি থেকে তুলে এনেছো ছিন্ন রত্নহার?
মূল্য যদি চাও, হিসাব করে দেখো, মিলবেনা অঙ্কের ফল,
অলখে গচ্ছিত আছে, তোমার সঞ্চয় মাঝে আমার হৃদয়ের শেষ সম্বল ।

পথিকের পরিতাপ

দিন মোর মুসাফির, পথের গান গায়
নতুন সরাইখানায় নতুন সূরা চায় ।
তবু ছাড়তে হয় যখন তোমার আলয়
কেন চোখে ভরে জল, মনে ছায়া ঘনায়?

লুকানো মণি

বলেছিলাম এখন নয়, মনের দরজা খুলতে বড় ভয়
তোমারো কি জমে আছে কথা, নাকি বিস্মরণের হল জয়?
কালস্রোতের সমুদ্রতলে, হয়েছে ব্যথার মুক্তোর সঞ্চয়,
একবার চুপিসারে বলে যাও, মুক্তমালা কি হবে ক্ষয়?

দ্বিধা

সবুজ গাছে বসে লাল পাখি গায়
ডাকলে দেয়না ধরা, দূরে চলে যায়,
আমিও মনের গান বাঁধি কত সুরে,
তোমার কাছে যাই, তবু পালাই দূরে ।

অস্ফুট

দেওয়া নেওয়া হলো না তো, শুধু হল পরিচয়
ভোরের আলো ফুটেছিল, তবু হয়নি সূর্যোদয় ।
তারারাই বুঝেছিল মনের গোপন ভাষা,
চলার পথে হারিয়েছিল অচেনা ভালোবাসা ।

জাতীয়তাবোধ

শত্রুকে গেছে চেনা, বলেছেন মহারাজ,
দেশ হল দেবতা, শত্রুনিধন মহান কাজ।
বইবে শোণিত ধারা বলি হবে কতো প্রাণ,
দেশ হবে মহান, বাড়বে রাজার মান।

আত্মসন্ধান

মেলা হল শেষ, মলিন হল বেশ, কেউ কি দাঁড়ায়ে আছে তাহার তরে?
জীবন নদীর তীরে, সে ডাকে ফিরে ফিরে, কে হবে সাথী তার শেষ পরাপরে
একাকী অন্তরে হয়তো পাবে সে খুঁজে জীবনের অসীম মন্ত্র
নিঃস্ব হবার ঐশ্বর্য হয়তো ভরে দেবে তার জীবনের রিক্ত পাত্র।

নেশা

জীবনটা শুধুই নেশা, ভাসায় অতল সুখে
মোহময় কত সুরা, তুলেছি আমার মুখে।
সহসা কি যে হল, পরান উঠল দুলে
মদিরায় নেশা কই, নেশা যে তোমার চোখে ।

রাতের মায়া

আমাকে বলে রাতের তারা, কথা যে মোর হয়নি সারা
আমার মোহন আলোর রেশ, দিনের আলোয় হবে শেষ ।
এখনই কর স্বপ্ন সৃষ্টি, আসুক নয়নে ভাবের বৃষ্টি
সূর্যালোকে অন্ধ যে হবে অন্তর্মুখী দৃষ্টি।

নিঃস্ব

ছিল চোখ ভরে কত দেখা, ছিল অন্তরের কথা বলা ,
তবু নাগালে যায়নি পাওয়া , শুধু ছিল মোর পথ চলা।
দুর্লভ কত পল গেছে চেতনাকে দিয়ে দোলা
জীবনের ঘাটে বসে, যায়না যে তারে ভোলা ।

আশিস মুখার্জী, মমী, ওহাইওর বাসিন্দা । পেশায় ডাক্তার, ভালবাসেন বেড়াতে, লেখালেখি করতে আর কম্প্যুটর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ।

Rudranshu Das
Age: 4
Grade: UPK

Planets

Arna Saha
Age: 5
Grade:1
City: New Hartford, NY (Utica).

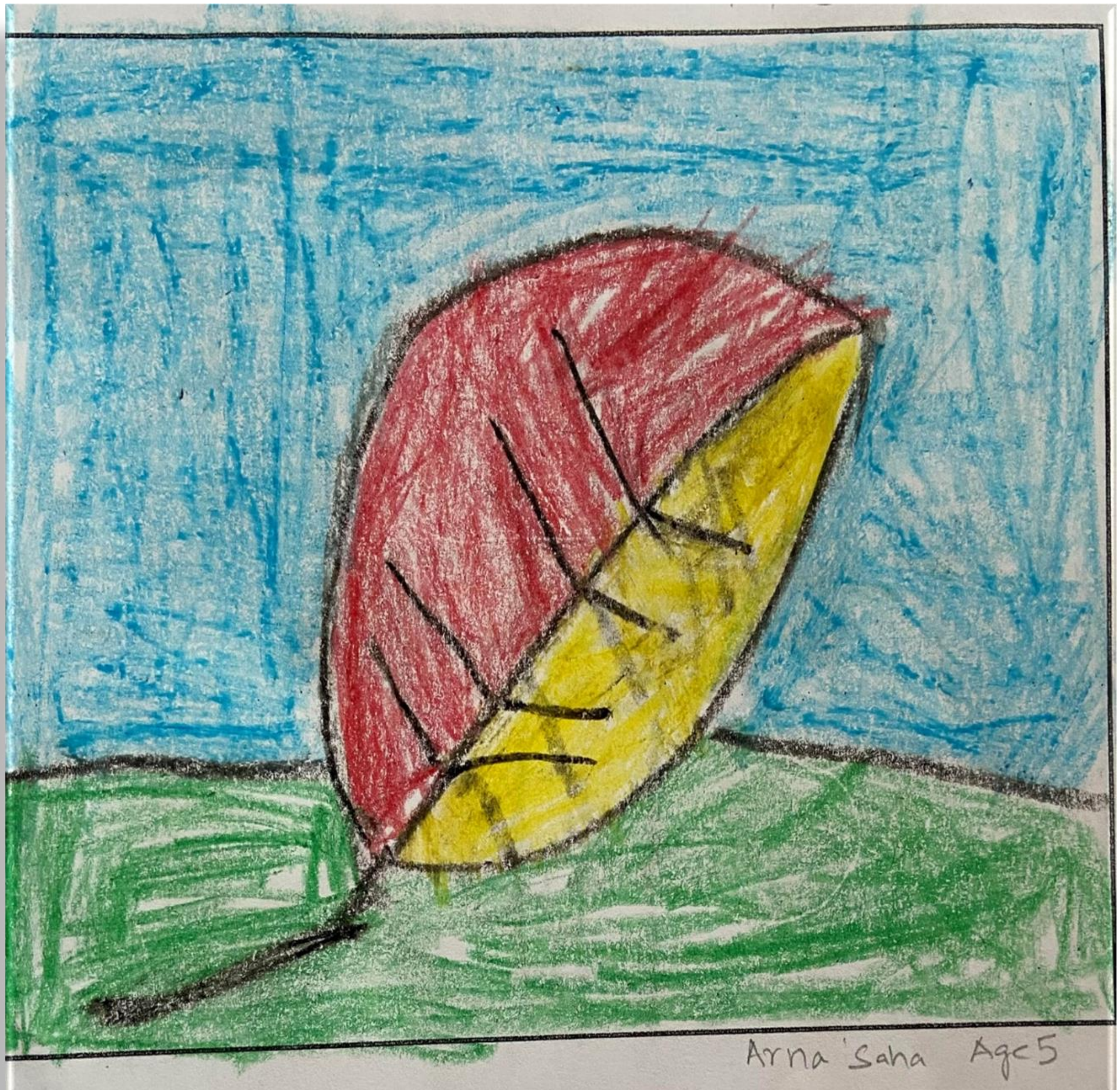

Amritakshi Sanyal

Age:10, Grade: 5

Besides her studies, she enjoys playing with her friends at school and in her neighborhood, playing with her dolls and toys, board games, badminton, and chess. She also loves traveling and visiting different places and peoples, and (occasionally) writing poems and short stories.

Charismatic Fall Leaves by Amritakshi Sanyal

Yellow, orange, and red,
The falling leaves create a bed.

Swishing all around,
Until they fall to the ground.

When the autumn winds start to blow,
I love to see your colors glow.

It is a pleasure to see you billow,
Then fall to the ground to create a pillow.

Dancing up and down the roads,
And hopping along the ground like toads.

As the weather starts to cool,
I love to look at your fire-colored pool.

Now I have a burning desire:
I want you to remain the color of fire.

.

But as the days shorten, you turn brown,
While the autumn winds blow you around town.

As I gather you up in a pile,
I realize that you are light and fragile.

In early October, I saw you hanging strong from a branch,
Now you break under my feet with a crunch.

As winter approaches, I don't see you around,
By now you have been buried in the ground.

While I realize that you are not here,
I hope to see your new growth next year.

School year during COVID-19
Which one is better? Online vs. In-person
Meenakshi Chakravadhanula

"It's another morning, and another day, as I log onto my zoom class. I hear a pleasant ding, and it asks me to select either Wi-Fi, Dial in, or No audio. I click Wi-fi, and as I see my bright and lively first period teacher trying to talk over the roar of the in-person students, the rest of the zoom class is looking the same always. Some people have their videos on, bright and ready (very few are like that) while others are slowly turning on their videos, munching their breakfasts. As I open the google slide for the day, I think, I wish I was in-person."

This was a typical morning for a lot of students in the 2020-2021 school year. Maybe not everyone wanted to be in-person, but a lot of people did. As lockdown continued, full time online school suddenly became a surprisingly manageable regular thing.

When we were asked to stay home initially in March of 2020, "many people thought it would be temporary, because the officials said it would only be 2 or 3 weeks", says one woman. Elementary school kids had it easy workwise, but it was hard to do it online, and even some teachers struggled through the transition. "I had a total of 3 or 4 class zoom meetings the rest of the school year in Spring 2020", reported a 5th grade girl. "My teacher used to send us weekly paper packets home and absolutely no zoom meetings for the first couple of months. I had no clue how to even connect back with my class". Teachers themselves were struggling to navigate through the murky waters of technology, so they didn't have much time to help their students individually. School is a combination of fun with friends and learning. That's practically all we do. So, when COVID hit, it was hard to see friends. Even if you got a chance to talk to them online, it just wasn't the same.

Middle school was similar, but the students were more jubilant at first. "I was ecstatic", says one soon to be tenth grader, "All my exams were cancelled!" When asked how long he thought the pandemic would last, he said, "I knew that it would at least last summer. I hoped that 9th grade might have been in-person."

High school and College were alike, but a little bit different from Middle and elementary schools. As one College professor states, “Some students benefited greatly from the lockdown, while others quit participating or couldn’t pass the course.” Therefore, it was great that in the 2020-2021 school year, both in-person and online options were available. Which brings us to the question of which one is better: online or in-person schooling?

“Online school is far more difficult than you would think. Keeping track of deadlines was hard. There were no reminders, and teachers used different platforms to communicate with the student and finding a particular homework or assignment was easier said than done. “You just need to maintain a personal calendar for everything. This transition was hard for an online 6th grader who just graduated from the otherwise easy-going elementary attitude. Also, in online school there is a lower proportion of socializing and learning”, explains the rising 10th grader. “Online school was like a break from in-person school, but as always, too much of [online school/break] can bring you to not like it as much”, agrees a 7th grader.

Another problem with in-person schooling was the safety mandates. Wearing a mask all day can be stifling, especially in the summer heat, not to mention that in the cafeteria no one was allowed to turn around and talk to whoever was behind them nor were they allowed to talk to anyone next to (6 feet away) them. Despite all this, a lot of students would want to go to in-person school. “When
I first went in-person again, I was so overjoyed to see all of my classmates and teachers and school for real that I didn’t care too much about the masks and social distancing. Online school still felt like a never-ending holiday!”, expresses one 6th grader.

I think the school district did a great job with the hybrid model- allowing a few days of interaction with fellow classmates and teachers. I am really looking forward to go back to school again.

Meenakshi Chakravadnula: Age:12: Grade 7

Ella Bagchi: Age 12: Grade: 7 ***Ma Durga on Horse back***

Alice Bhawal: Age:12, Grade: 7

Alice Bhawal

Indian education system: what needs to be changed

Sriram Chakravadhanula

It is a Steaming hot sunny Day in Hyderabad as a student walks into the large hall where she would take the JEE(Main) examination. Passing this exam could take her to the best colleges India has to offer, but with 400,000 kids taking the exam, it is even worth it? Only 0.92 percent can get into the IIT's. She thought about her parents, how they worked so hard to get her this far, thought about what a waste all that studying would have been if she didn't make the cut.

With an empty bubble filling her stomach with tension, she wanted to scream. India's education system is very competitive. Along with super tough syllabus, societal pressures, hard working parents, and the idea that exams define life, it is no wonder India has the highest suicide rates for ages 15-29. India, like many other countries needs a better education system.

In order to be able to argue in favor of or against said changes in this essay, we must first understand the Indian examination system, how they work, and how competitive they are. In India, there is a population of approximately 1.4 Million people. Competition for wanted jobs is very high. With a plethora of exams, and every little point making a huge difference, most children have no time for extracurricular activities, and study for hours on end. The industry has taken this competitive nature, and made a business In order to pass exams, students in India are enrolled in disciplined coaching centers, which keep students memorizing textbook after textbook in order to study for the exams. These coaching centers are a necessity for a good education, and the good coaching institutes are quite expensive.

In regards to India's entrance exams, there are three major exams. The hardest exam you can take is the UPSC(Union public service commission). This exam, which is ranked 3rd in the world for hardest exam, is the exam for those wanting a job in civil services, or other government positions. With over 32 hours of examination and over 20 subjects to be tested on (including a personality test), it is very competitive and well sought out. Then there is also JEE, for any engineering career, for a seat in IIT (Indian Institute of Technology) a very prestigious school, and international colleges also take JEE into credit (such as Cambridge and Oxford). Over 400,000 Candidates take the JEE exam, only about 9K are allowed into the IIT colleges. In 2017, only 0.92 percent passed JEE-Advanced. Lastly, there is also the Medical exam, NEET, which is now an exam that you must take in India in order to get into any medical college. In order to pass these wickedly

difficult exams, you must enroll in a coaching center, possibly find a mentor, and more importantly, study very, very hard. This is where problems begin to arise.

Although some may argue that passing such exams will set you up for life, with a hefty salary and nice pension and such, but on the other hand exams are so competitive students are beginning to not have a 'life', in other words, a well-rounded day. The standard way of thinking for most Indian Parents in this regard was captured well in a VIVA comedy show, “Don’t give me this ‘Cricket is my passion and football is my pulsar nonsense’ your concentration is to pass 10th grade well, write the MPC, get a good engineering seat, and get a software job with good pay. This is life’s equation.” Of course this is emphasized satirically for the purpose of Comedy, but the fact remains that students do believe that in order to live happily they have to get good grades in these competitive exams, and then get a good college, then job. With constant containment within 4 walls of their bedroom, doing workbooks, and memorizing textbooks, students are working very hard with very little return. The fact remains the average student simply cannot achieve what they hope.

Take the medical exam for example. The exam now covers all of India's medical institutions. If you want to enter the medical field at any standpoint passing NEET is a necessity. Out of the 1.6 MILLION candidates who apply and take the exam, only 35 thousand people are accepted into colleges. That is a 2% acceptance rate for any who would like to study medicine in India! With such levels of competition, it is no wonder India boasts such high suicide rates. According to Dr. Amit Sen, psychiatric, “As students enter class 9, there’s this belief that’s whipped up in them that are only two things that will define a student’s future: The percentage of marks in the 12th board and which college they get into. All their effort and emotion are invested in these two things that if they fail they feel their life is doomed". In short, students believe that exam scores are the key to their future, failing would mean that they would have no life, both by societal pressures and family pressures. This is exactly the case with Varun Chandran, who was not able to take the UPSC exam because he arrived 4 minutes late. "There was anyway no point in living this life further. I anyway would just have been a living dead body. What had to happen has happened. It would have happened anytime, anywhere." (Excerpt from Varun Chandran's suicide note). Extreme pressure as such can only be solved by one thing, sparking interest in a particular subject by the student, and making sure success comes both in monetary and mental means. But above all, make sure the student enjoys whatever they are doing.

There are two ways to raise self-esteem in a student. One is to make sure that extracurricular activities are implemented into the School system, and the other, is to make sure Students have a wide range of career options and paths, without the societal pressures. Both ideas are being implemented into the United States, and in my opinion, results in a far better school system than India.

As said, in order to further evolve education in India, the Indian school system must implement extracurricular activities. Extracurricular activities allow students to try and experience new activities and interests in the world. According to Eileen O'Brien of Policy Studies Associates and Mary Rollefson of the National Center for Education Statistics, "[Extracurricular] activities offer opportunities for students to learn the values of teamwork,

individual and group responsibility, physical strength and endurance, competition, diversity, and a sense of culture and community... [Extracurriculars] provide a channel for reinforcing the lessons learned in the classroom, offering students the opportunity to apply academic skills in a real-world context, and are thus considered part of a well-rounded education." In short, Extracurricular activities make a student learn in a real-world environment, and more importantly make the student enjoy learning. This, according to the same article, even allows students to put more effort into their schoolwork and become more interested in the subjects that they are learning. It's simple really, the more students enjoy what they are doing, the more they study, the less pressure they feel, and far lower suicide rates. In fact, in Kriti Tripathi's suicide note, she said the following, 'You manipulated me as a kid to like science. I took science to make you happy. I had interest in astrophysics and quantum physics. I still love writing, English, history...and they are capable of exciting me in the darkest times." This tells us two things, one, Kriti would have been happier had she been able to study what she wanted, and two, She was forced to learn science by her parents and society.

Which bring us to our second solution to contain the rising levels of competition in India. Giving more career options and pathways in India. Society pushes you to do one of three things in India. Get a well payed government job by taking the stifling UPSC Exam. Become an Engineer by taking the JEE exam. Or become a doctor by taking the NEET exam. According to Tabassum Ara, "neighbors, relatives, friends, colleagues at workplace. has a few selected questions for [parents of students]. Like, how did your son do in the exams? What is the percentage, rank, division etc.? Why did he score so low? Didn't you arrange for tutors, extra classes? We could have referred you to the best coaching institute if you would have asked. This is really frustrating for parents since they are made to feel as if they have not taken the studies of their child seriously or compromised on the quality of coaching. Poor fellows are even told that their child might not make it to the next level with the marks scored. This fills them with a sense of insecurity thus leading to tension at home." In other words, parents interact with society, and hence raise tensions at home, for better results and studies. Parents feel tension, as the education of their child is the most important thing in the world, and so does the student themselves. This is another prime reason for India's high suicide rates. Simply, they cannot cope with the constant competiting and comparing to those around them. The way to solve this is to simply let the student try a few different things (through extracurriculars) and then encourage them to follow their interests throughout their life. Whatever they do, they will exceed in, because they want to do it, because they enjoy doing it.

In conclusion, India's education system is ruthless in that it is highly competitive and places societal pressures on a student. This is not to say that the system is necessarily bad. India produces some of the best minds in the world, but the system itself leads to more suicides in India than death by car accidents. Why should it matter? Because knowledge of these problems is the only way the solutions can be implemented and understood.

Sriram Chakravadhanula: Age: 15, Grade: 10

The Trip That Never Happened

Gavriie Singh

I don’t know about you, but I am certain that everyone as a collective society can agree that Covid-19 has been a real pestering annoyance. It has varied from being a nuisance, to ruining many plans, lives, and everything else since the year 2020 for everyone. In my case, I had planned on going to India in the summer of 2020. Covid had different plans for me, and this is how it went.

During most of the summers, we would travel to India to visit my grandparents and extended family. It is always a pleasure and treat to meet my cousins, go on sightseeing trips, and in general just spend time with them. But ever since the rapidly increasing cases of Covid-19 and travel restrictions started, I have not been able to go visit India. However, this also led me to think about old memories of my visit to India a few years back. I remember going to the Rock Garden in Chandigarh with my grandparents and one of my cousins from older pictures. The sculptures in the picture got me curious and I discussed it with my mom. She told me that the Rock garden was made by a genius vernacular artist Nek Chand and is among one of the largest folk art environments in the world. This piqued my interest and I wanted to learn more, so I searched it online and found a book from a well known architect/historian, Soumyen Bandyopadhyay, that beautifully explains the architecture and the landscape, along with beautiful color illustrations. It took me down the memory lane, of fun times I had while seeing various sculptures, the waterfall, the decorated gate, and more. I remember the good times, great food, and unique experiences.

I got done with the book but still was left with long summer days with nowhere to go. So, one morning while chatting with my grandparents

I expressed my frustration about how I had nothing to do, and they suggested that I should take a look at the epics of Ramayana and Mahabharata. It sparked my curiosity, so I decided to watch the movies on both, and then read more detailed books over the summer. We ordered both Ramayana and Mahabharata by Krishna Dharma. Reading the epic Ramayana enlightened me about the right path of dharma and karma. In Mahabharata, Krishna explains to Arjuna his obligations as a prince and clarifies insights regarding distinctive Yogic and Vedantic examples of reasoning and thoughts, with models and examples. This has prompted the Gita being frequently used as a guide to life and righteousness.

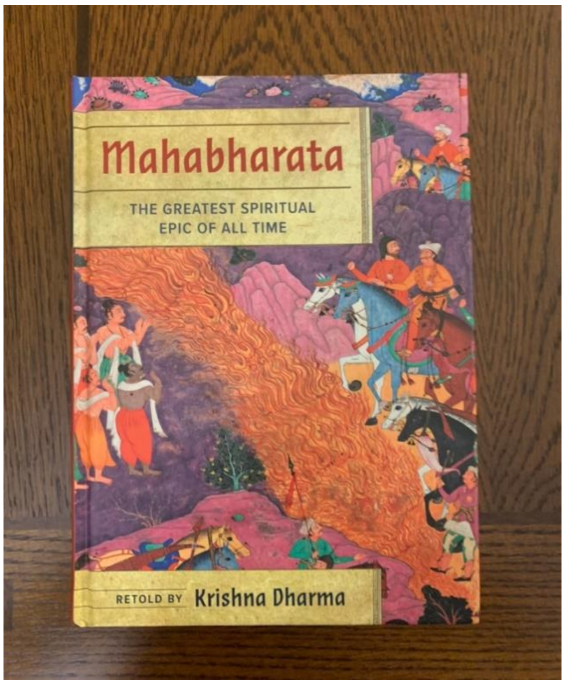

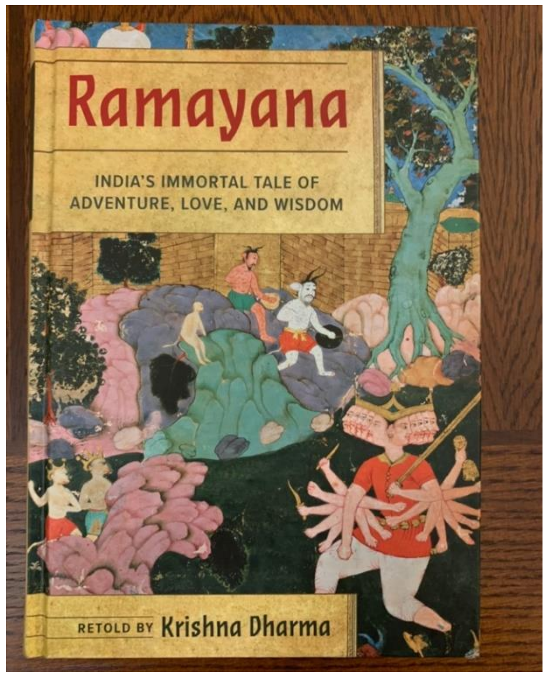

During this long, annoying, and frustrating period that Covid caused us by trapping us in our houses, I tried to pass the time learning something new. All this made my summer very interesting and led to thought provoking discussions with my family keeping me occupied throughout. I still look back on memories with family that I loved and cherish. What did you do while Covid-19 kept you locked up in your house? Did you spend time with your family? Did you remember any joyful moments that you wish you could go back to before the pandemic?

Gavriie Singh, 10th Grade, Vestal High School

Arpan Dasgupta lives with his parents in New Hartford, New York. Arpan, a 11th grade student, loves to paint and do photography.

Arpan Dasgupta

এক উদাসী বাউল...

অনসূয়া দত্ত

"পরনে আলখাল্লা কাঁধেতে ঝোলা
এক হাতে একতারা তাতে দিল দোলা
দুলিয়ে যেত আপনভোলা খোলা মাঠে
গগন ফকির গাইত গান পথে ঘাটে"।।

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী অজয় চক্রবর্তীর কণ্ঠে এই বাউল গানটি শুনে 'গগন ফকিরের' প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য অন্তর্জালের দ্বারস্থ হলাম, এবং পেয়েও গেলাম বহু অজানা তথ্য।

এই গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে কত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, যারা সারা জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। তেমনি এক ছাই চাপা প্রতিভা ছিলেন 'গগন হরকরা'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে বলেছিলেন 'এক বিস্ময়কর প্রতিভা'।

এই লোকশিল্পীর আসল নাম 'গগন চন্দ্র দাম'। কিন্তু গগন হরকরা নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আনুমানিক ১৮৪৫ সালে এই বাউল সাধকের জন্ম। পেশায়ে তিনি শিলাইদহের ডাকঘরে চিঠি বিলির কাজ করতেন, তাই লোক মুখে তার নাম ছিল 'গগন হরকরা'। এই পেশার পাশাপাশি ছিল সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা আর তার সঙ্গে ছিল দরদি গানের গলা। বিভিন্ন গানের আসরে 'সখি সংবাদ' এর গানে করুন রসের আবেশ লাগিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। তিনি কার কাছ থেকে গানের দীক্ষা নিয়েছিলেন তা কারোর জানা নেই কিন্তু তিনি বাউল সম্রাট লালন ফকিরের অন্ধ ভক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাউল কবির সান্নিধ্যে আসেন যখন তিনি পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী জেলার পল্লী অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত করতেন (১৮৮৯-১৯০২)। সেই সময় পল্লীগ্রামের লোক-সংস্কৃতির স্পর্শ পেয়েছিলেন কবিগুরু। গ্রামের উদার মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতির নিবিড় যোগ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এই সময় তিনি বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। লালন, গোসাঁই গোপাল, ফিকিরচাঁদ, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী এবং গোসাঁই রামলালের মতো অসংখ্য বাউলের সাথে তার পরিচয় ঘটে। বাউল-ফকিরদের গান কবিকে অন্য এক সুরের ভুবনে নিয়ে যেতো। কবির কথায়, "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা

সাক্ষাত হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে" (উৎস – শান্তিদেব ঘোষ)। তার থেকেই বোঝা যায় কবির আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে বাউলের বানী ও সুর খুব সহজে মিশে গিয়েছিল।

এইসব বাউল-ফকিরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন গগন হরকরা, তা কবির ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথের এক লেখায় পাওয়া যায়। শিলাইদহে দু'জনের যখন দেখা হতো, তখন তারা প্রায় সময় সঙ্গীতচর্চা এবং গানের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। গগনের সাথে অদ্ভুতভাবে কবিগুরুর পরিচয় ঘটে। একদিন কবি বজরার ছাদে বসে পদ্মার শোভা উপভোগ করছিলেন। এমন সময় পোস্ট অফিসের এক পিয়ন চিঠির থলে পিঠে নিয়ে আপন মনে গান করতে করতে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে গান শুনে কবি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি সেই ডাক হরকরাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কবির কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, তার নাম গগনচন্দ্র দাম। গ্রামের সাধারণ এক মানুষ, নিজের রচিত গানে নিজেই সুর দেন। তার কয়েকটি গানের মধ্যে অন্যতম

"আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।।
হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।। ...." গগন হরকরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তৎকালীন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় ও বাউল পত্রিকায় গগন
হরকরার সেই গানের বাণী প্রকাশ করেছিলেন। বাউল গানের একটি সংকলিত গ্রন্থের সমালোচনায়ে কবি লিখেছেন, 'এই গানটির কথা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ এক অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল। উপনিষদের বানী 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' অর্থাৎ 'অনন্তের সঙ্গে মিলন' সমগ্র মানবজীবনে দেহস্থিত পরমাত্মার সংগে মিলন'। বাউল ও লালন বিষয়ক পন্ডিত অধ্যাপক উপেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যায়, 'মানবদেহকে অবলম্বন করেই আত্মার বাস ও মানবদেহের সাধনার দ্বারাই তিনি লভ্য, তাই বাউল দর্শন অনুযায়ী সেও মানুষ। আর অলক্ষ্য অবস্থায় সে হৃদয় বা মনে বাস করে বলে সে মনের মানুষ'। বাউলের 'মনের মানুষ'ই পরবর্তীকালে কবির কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে জীবন দেবতা রূপে দেখা দিয়েছিল।

বাউলের ভিত্তি হলো বহুবিধ ধর্ম-দর্শনে সৃষ্ট "বাউলতত্ব"। এই তত্বকে যখন বিশেষ সুরে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তা হয়ে উঠে বাউল গান। এবং এই তত্বকে মান্য করে যারা স্বতন্ত্র জীবনযাপনের পথ বেছে নেন, তারাই বাউল বা বাউল সাধক। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলেছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ও সুফি ধর্ম। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে মূল সাধনাঙ্গ এক হওয়ায় সহজিয়া মুসলমান ফকিরদের মিলনে আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাউলধর্মের উদ্ভব। মুসলমান ফকিররাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। কিন্তু উভয় বাংলায় বাউল গান ধর্মসঙ্গীত হিসাবেই পরিচিত। এই গানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক।

বাংলাদেশের লোকায়ত ধর্মদর্শন এই বাউল দর্শন। বাউল দর্শনের যে জিনিসটা কবির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে তাদের 'সমস্ত সামাজিক সংস্কার বিধিনিষেধ, প্রথা, রীতিনীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা।' রবীন্দ্র দর্শনের মূল কথাও তাই। রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হয়েছিলেন বাউল চিন্তার সঙ্গে নিজস্ব দর্শনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখে। লোক জীবন সমুত্থিত বলেই রবীন্দ্রনাথ একে 'জনগণের দর্শন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই লোকায়ত দর্শনের কাছে তাঁর ঋণ তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। (দৈনিক জনকন্ঠ, ৮/৫/২০১৯)

সময়টা ১৯০৫ সাল। ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করতে উদ্যত হলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশ জারি করলেন। এই আদেশ আলোড়ন তুললো সারা বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতার সুধীজনের মাঝে তার ব্যাপক

প্রভাব পড়লো। প্রতিবাদের ঢেউ উঠলো সারা বাংলায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও এ প্রতিবাদে অংশ নেন। প্রতিবাদের জন্য চাই নতুন স্বদেশী গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন,

“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥“
(বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃত)

স্বদেশ পর্যায়ের এ গানটিতে সুর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাবো তারে’ গানের সুরের আশ্রয় নিলেন। বাংলার এক লোকশিল্পীর গানের সাথে কবির স্বদেশ ভাবনার গানে এমন সার্থক রূপ দিতে পেরে কবি বলেছিলেন, ‘এই গানের সুর বাউল গান থেকে নেওয়া’ - প্রকৃত বাংলার লোকায়ত সুর ও তার সহজ সরল প্রকাশ রীতি গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতিকেই তুলে ধরে। কবিগুরু যে জেনেশুনে গগনের গানের সুর ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটিতে বসিয়েছিলেন, তা তার মন্ত্রশিষ্য ও ছায়া সঙ্গী শান্তিদেব ঘোষের এক লেখা থেকেও জানা যায়। গানটি যে কবিকে বেশ প্রভাবিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনের আরও একটি গান ‘*ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে, কতকাল এমনিভাবে’* এই গানটির সুরের আদলে রচনা করেন, *“যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা!”*

গগন তার সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে কবিগুরুকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করেছেন। তাই ‘প্রবাসী’ পত্রিকার বাংলার ১৩২২ সালে বৈশাখ সংখ্যায় ‘হারমণি’ বিভাগ চালু হলে ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’-ভাব-তত্ত্বের এ গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের সূচনা করেন। এই গানের মধ্যে দিয়ে কবিগুরু বাংলার এক প্রান্তিক শিল্পীকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নানা প্রবন্ধ এবং দেশে-বিদেশে দেয়া তার বিভিন্ন বক্তৃতায় বাউলের উদার ধর্মমতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লালন-গগনের গানের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তার ‘মানবধর্ম’ (১৯৩০) প্রবন্ধে বাউলের মানবতাবাদী দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত *‘An Indian Folk Religion’* শীর্ষক এক আলোচনা সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনের ‘কোথায় পাবো তারে’ গানটিকে উল্লেখ করে বলেন,

"The first baul song, which I chanced to hear with any attention, profoundly stirred my mind."

গগনের জীবন থেকে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ডাকঘর’ নাটকটি লিখেছিলেন বলে তার বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়।

গগন হরকরা আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রচুর গান রচনা করেছিলেন। তার সহজ-সরল শব্দময় এসব গানে মানবজীবনের রহস্য, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েকটি গান সম্পর্কে জানা গেলেও তার অধিকাংশ রচনা সম্পর্কে তেমন একটা জানা যায় না। সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তার রচিত অনেক গানের কথা ও সুর। বাংলা ১৩০২ সালে, মাঘ সংখ্যা ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবি ভাগনী সরলা দেবী গগনের কয়েকটি গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করে তাকে সাহিত্যাঙ্গনে উপস্থাপন করেন।

(This article is compiled from various publications and websites available on the internet in an attempt to find the historical origin of Bangladesh's national anthem at the dawn of its 50th Anniversary of Independence.)

References:
গগন হরকরা: যে বাউলের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সখ্যতা ছিল - প্রকাশ নাথ
https://www.itihasadda.in/bangla-baul
রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউলগানের প্রভাব – বঙ্গদর্শন, ৫ জানুয়ারি, ২০১৮
শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্র সংগীত, পৃষ্ঠা-৮৪, ১৩০
রবি-জীবনী- প্রশান্ত কুমার পাল
প্রথম আলো (১ম খণ্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ইথাকা, নিউ ইয়র্কের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরতা, অনসূয়া ইদানীং কালে তার শিল্পী সুলভ চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী। এই রচনাটি তারই একটি ছোট প্রয়াস।

একটি গান ও লুকিয়ে থাকা ইতিহাস

দিলীপ হরি

"ভারত আমার ভারতবর্ষ
স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো।"
গানটি কার লেখা?
এই নিয়ে একটা কুইজ হয়ে যেতে পারে। চাইলে, নিজের পরিচিত মহলে এই প্রশ্নটি রাখতে পারেন। দেখুন, নানা রকম উত্তর পাবেন।

কেউ বলবেন, এটি দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা। কেউ বলবেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা। আরও কিছু নাম ভেসে আসতে পারে। কিন্তু এই দুটো উত্তরই বেশি পাবেন। বাঙালির পনেরোই আগস্ট যে গানটা অনিবার্য, সেই গান সম্পর্কে, তার স্রষ্টাদের সম্পর্কে আমরা একেবারেই উদাসীন।

না, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবি ঠাকুর, কারও গানই নয়। গানের শেষ স্তবক মনে করুন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ। রবি ঠাকুর নিশ্চয় নিজেকে নিয়ে এমন কথা লিখবেন না। আর দ্বিজেন্দ্রলাল ? তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন সুভাষচন্দ্রের বয়স আঠারো পেরোয়নি। তিনিও নিশ্চয় 'বীর সুভাষের মহান দেশ' লিখবেন না। তাহলে? আসলে, এই গানটা লেখা হয়েছিল তার অনেক পরে, সাতের দশকে।

লিখেছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর দিয়েছিলেন অজয় দাস। গেয়েছিলেন মান্না দে।
না, এটা মোটেই দেশাত্মবোধক গান হিসেবে তৈরি হয়নি। চিন্ময় রায় অভিনীত চারমূর্তি ছবিটা নিশ্চয় দেখেছেন। সেখানে চিন্ময় ছিলেন টেনিদা-র ভূমিকায়। সেই ছবির জন্যই গানটা লেখা হয়েছিল। চিন্ময়কে গান গাইতে বলা হবে, তিনি হারমোনিয়াম নিয়ে একটি প্যারোডি গান গাইবেন, এই সিকোয়েন্সে গানটি তৈরি হয়। সেই চারমূর্তি ছবিতেই প্রথবার গানটি ব্যবহার করা হয়।

পরে এই গানটাই যে এমন দেশাত্মবোধক গানের চেহারা পাবে, কে জানত! গানের গীতিকার ২০০৯ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, সুরকার অজয় দাস বছর দুই আগেও বেঁচে ছিলেন। তাঁরা দুজনেই ভাবতে পারেননি এই গান প্রায় আড়াইশো স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত হয়ে উঠবে।
অজয় দাস বলেছিলেন, আমাকে বলা হয়েছিল, একটা প্যারোডি সুর করতে। বঙ্গ আমার, জননী আমার- দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানের আদলে সুর করেছিলাম। তাই হয়ত অনেকে বলে থাকেন, এটা দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

আর গীতিকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ? তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি কখনই ভাবিনি,

এটা একদিন স্বদেশ পর্যায়ের গান হয়ে উঠবে। আগে থেকে এত ভাবলে হয়ত লিখতেই পারতাম না। ছবিটা বেরোনোর কয়েক বছর পরই গানটা অদ্ভুতভাবে জনপ্রিয় হতে শুরু করল। আমি যে গানটা লিখেছি, আমার পরিচিত লোকেরাও বিশ্বাস করত না।'

হ্যাঁ, অনেকবার অনেক কষ্টও এনে দিয়েছে এই গানটা। শিবদাসবাবুর বাড়ির আশেপাশেই হয়ত পনেরোই আগস্ট তারস্বরে এই গান বাজছে। জানালা দিয়ে কানে আসছে। কিন্তু পতাকা তোলার জন্য তাঁকে ডাকা হয়নি। এমনকি মঞ্চে অতিথিদের তালিকাতেও জায়গা হয়নি। কারণ, এই গানের রচয়িতা যে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বেই থাকেন, এটা উদ্যোক্তাদের অনেকেই হয়ত জানতেন না। বা জানলেও ডাকার প্রয়োজন মনে করেননি। তখন নিজের সৃষ্টির জন্য নীরবে দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছেন মানুষটি।

গীতিকার, সুরকার, গায়ক- কেউই আর বেঁচে নেই। পরপর লাইন দিয়ে যেন চলে গেলেন। গানটা তো অমরত্ব পেয়েছে। তাই সে থেকে গেল।

"BHS Alumni Founder group থেকে সংগৃহীত"

Dilip Hari is a CPA and Chartered Accountant by profession. He also attended Cornell School of Hotel Management and became a Hotelier. He owns his hotel company DPNY Hospitality which owns Doubletree by Hilton, Sheraton Hotel, Hampton Inn and Best Western. The website is www.dpnyhospitality.com.

সবুজ রঙের ডায়েরি

পায়েল চ্যাটার্জি

১ আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জায়েদ। ক্যাম্পের বাইরে আকাশটা ভারী উজ্জ্বল। কি ঝলমলে রোদ। ছোট ছোট টিলার মতো পাহাড় জেগে রয়েছে আকাশের বুকে। খাতা, পেন নিয়ে বসলো জায়েদ। কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারছে না। 'ক্রিয়েটরস ব্লক'। কোনো একটা গল্পের বইতে পড়েছে শব্দটা। কয়েকদিন ধরেই ও বুঝতে পারছে। চাইলেও শব্দরা ধরা দিচ্ছে না। তবে কি ফুরিয়ে যাচ্ছে সব? অবান্তর ভাবনা। ঠিক বিকেলের ধূসর আকাশের মত। আম্মি চলে আসবে এখনি। ছেলেকে এমন উদাস দেখলেই মায়ের চোখে মুখে স্পষ্ট হয় মেঘ। জায়েদ জানে। আম্মি এখনো স্বপ্ন দেখে। আশা করে। ক্যাম্পের স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতেও গুন গুন করে ওঠে আম্মি। গলায় কত সুর। অবাক হয়ে যায় জায়েদ। ওদের সুরহীন, ক্লিশে জীবনে আম্মি মোহনার মতো। কত দূর থেকে কাজ করে ফিরেও ক্লান্তিহীন মুখ। ঝরঝরে হাসি। যেন দুঃখের অনন্ত পথ পাড়ি দিয়ে মুক্তির আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। কিন্তু আম্মির চোখে কি যেন দেখতে পায় জায়েদ। সযত্নে যা লুকানো থাকে। মাঝে মাঝে ওর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। মায়ের মলিনতাহীন হাসিতে সেই ইচ্ছেরা বিলীন হয়ে যায়।

ঘরে ঢুকেই টিফিন-বক্স মেঝেতে রাখল শামিমা। রুটি আর অল্প একটু সবজি। কিনে এনেছে ছেলের জন্য। বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট একটা ব্যাগ। শতছিন্ন। খুচরো হিসেব। বড় হিসেব করার অবকাশ নেই ওর। জায়েদ ওদের ক্যাম্পের বাইরে টুল নিয়ে বসে আছে। আফগানিস্তানের এই গ্রামটা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। শরণার্থী ক্যাম্পগুলো এখানেই। ওদের ছোট্ট পৃথিবী। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি সয়ে চলা তাঁবু। ওর জীবনের মত। ভারত থেকে সীমানা পার করে শামীমা যখন ছোট্ট জায়েদের হাত ধরে চলে এসেছিল, শরীরের মত ওর চোখও ছিল বোরখা-আবৃত। মনেও আড়াল।

কবীরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল নাবালিকা শামিমা। আবেগ, অনুভূতির মায়াজালে আচ্ছন্ন কিশোরী খোঁজ নেয়নি প্রেমিকের জীবনধারার। সময় আর ভালবাসার গতিতে ভেসে গিয়েছে বৈষয়িক বুদ্ধি। শুরুর কয়েক বছর তবে ভালো ছিল। বস্তির ছোট ঘর, প্রায় মেঝে ছুঁয়ে ফেলা চৌকি, ঝুল পড়া দেওয়াল, টালির ছাদ, জ্যোৎস্নায় মাখামাখি দিন-রাত। এক থালায় খাওয়া, রাতে ঘর্মাক্ত দুটো শরীরের মিশে যাওয়ায় কোথাও সন্দেহের আঁশটে গন্ধ ছিল না।

তারপর একটা রাত। রহস্যময় একটা ফোনের পরে কবীর বেপাত্তা। দিন-রাত শামিমা অপেক্ষা করেছে। দিনের ঝলমলে আলো আর রাতের ধূসর মোহময়তায় শামিমা খুঁজেছে আশ্রয়, মনের নিবিড় বাঁধন। জায়েদ ততদিনে পৃথিবীতে এসেছে। ছোট ছোট হাত-পা, আধো-আধো বুলি শামিমাকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন বুঝিয়েছে। পরিচারিকার কাজ করে সে জায়েদকে বড় করেছে একা একা। মানুষ যেখানে দীর্ঘকাল থাকে, সেখানে তার একটা শেকড় গজিয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের এই ছোট্ট গ্রামে শামিমার শেকড় সবেমাত্র নেমেছিল, দমকা বাতাসের মতো ফিরে এসেছিল তখন কবীর। শামিমা আবার 'স্বপ্ন' নামের হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছিল। কবীরের হাত ধরে পাড়ি দিলো আফগানিস্তানের দিকে। বছর সাতেকের জায়েদ, নতুন রোজগার, নতুন ঘরের আশায় এসে পৌঁছেছিল সীমানায়। দুঃস্বপ্নের আভাসটুকুও পায়নি তখনো।

কবীরের এক বন্ধুর বাড়িতে তখন আশ্রিত ওরা। আবার একটা রাত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কতগুলো গুলির আওয়াজ। চারিদিকে রক্ত-স্রোত। নৃশংস ভাবে ছিন্নভিন্ন কবীরের দেহ। বেশ কিছু জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে নাকি যোগ ছিল। কিছু বোঝার আগেই জীবন নামের 'বোঝা' মাথার ওপর এসে পড়ল। বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা দুটো চোখে ছিল বাঁচার আকুতি। সেনাবাহিনীর এক সহৃদয় অফিসারের

সাহায্যে জায়েদের হাত ধরে শামিমা পৌঁছেছিল আফগানিস্তানের শরণার্থী ক্যাম্পে। ওর ইচ্ছে করেনি পুরনো বাসায় ফিরে যেতে। ক্ষয়াটে চৌকি, নোনা-ধরা দেওয়াল, সোঁদা গন্ধের ভয়ে। 'স্বপ্ন'দের ভয়। স্মৃতির ভয়। স্মৃতি আর দুঃস্বপ্ন যখন একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে, অনিশ্চয়তার হাতেই সঁপে দিয়েছে জীবন। শুধু ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি। ক্যাম্প থেকে একটু দূরের শহরে স্কুলে পড়তে পাঠায় জায়েদকে।

দীর্ঘ আট বছরের ক্যাম্পের জীবন কোমলতা কেড়েছে নাবালক কিশোরের। ক্ষয়ে যাওয়া দৃষ্টি, উদাসী ভাবনা নিয়ে থাকে জায়েদ। শামিমা বোঝে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা হাসাহাসি করে ওকে নিয়ে। জায়েদের হাতে শব্দ আছে। কবিতা লেখে। যন্ত্রণা থাকলে বোধহয় শব্দেরা দয়ালু হয়। সহজেই ধরা দেয়। কষ্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। ঠিক যেমন শামিমার গলায় সুর ধরা দেয় আজও। কবীর স্বপ্ন দেখিয়েছিল। 'গান'। সবই দীর্ঘশ্বাসের তলায় চাপা পড়ে গেছে আজ।

জায়েদকে সবুজ রঙের ডায়েরিটা শামিমা কিনে দিয়েছে ওর জন্মদিনে। স্কুলের পরে বাকি সময়টুকু ওতেই কাটায়। যন্ত্রণারা ওদের জীবনে ক্লান্ত হয় না। তাও কি শান্ত ছেলে! এরই নাম কি ছদ্ম-বাঁচা? শিশুরা যা দেখে তাই শেখে। যেমন শামিমা সন্তানের জন্য কষ্টেও খুশির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মনে। জায়েদ অবিকল শিখেছে এটা। শুধু মা ও ছেলে একে অপরের দিকে তাকায় না আজকাল। দুজনেই যেন রহস্যময় গোপনীয়তার ভার বয়ে বেড়াচ্ছে।

২ রুটি-সবজিটা ছেলের থালায় ঢেলে দিল মা। হঠাৎ করেই চোখে-চোখ পড়ল একে অপরের। মেঘ-বৃষ্টি। দু'জনের চোখেই প্রশ্নমালা। অবয়বহীন প্রশ্নেরা ওদের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে। নীরবতা ভাঙলো শামিমা। সবুজ ডায়েরির ওপর পেনটা রেখে দিল। নতুন পেন। কিনে এনেছে শামিমা। ছেলের মুখে হালকা হাসি। শুকনো। শামিমার বুক কাঁপে। কিসের যেন হাতছানি দেখতে পায় জায়েদের চোখে। অন্ধকার মাখানো। ছায়া জড়ানো। প্রশ্ন করতে সাহস পায় না, পাল্টা প্রশ্নের ভয়ে।

রান্না সেরে স্নান করতে গেল শামিমা। বাথরুম বলতে একটুকরো দরজার আড়াল। সামান্য জলের ব্যবস্থা। ভয় করে। কেউ যদি দরজার আড়াল ভেঙে দেয়! নিজের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে শিরশির করে উঠলো ও। ঘেন্নায়। কত হাত-বদল। দীর্ঘ আট বছর। এভাবেই দিন গুজরান। ছেলের পড়াশোনা, নিজেদের আশ্রয়। একজন 'বাবু'র সঙ্গে কথা হয়েছে। একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে সে। কয়েক মাসের অপেক্ষা। মাথার উপর শক্ত-পোক্ত ছাদ পাবে শামিমা। শরীরের বিনিময়ে পাওয়া ছাদের স্থায়িত্ব কতদিন? তবুও ছেলেকে নিরাপদ জীবন দেওয়ার লোভ। কারোর বাড়িতে কাজ করেও কোনো মতে গ্রাসাচ্ছাদন জুটিয়ে নিতে পারত শামিমা। কিন্তু জায়েদকে 'কবীর' হতে দিতে চায়নিও। নিরাপত্তা। স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা। শরণার্থী ক্যাম্পে আসার পর থেকেই এ পথে নেমেছে। ক্যাম্পের অনেক 'জীবন' এভাবেই চলে। তবে আজকাল বড় ভয় করে ওর! জায়েদ যেন কেমন খোলসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে! কবীর হয়ে যাবে নাতো ও?

৩ অন্ধকার ঘরটাতে কেমন দমবন্ধ লাগছে জায়েদের। সঙ্গে ওর সবুজ ডায়েরিটা। ওর প্রাণবায়ু। কয়েকজন আপাদমস্তক ঢাকা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। অস্বস্তিকর গন্ধ। সকলের হাতেই লম্বা নলওয়ালা বন্দুক। স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে আম্মির মুখ ভাসছে যেন। ওরা এখনই জায়েদকে নিয়ে যাবে। ওর শরীরে ভরে দেবে মৃত্যুর পরোয়ানা। তারপর জায়েদ পৌঁছে যাবে সীমানায়। বাকিটা? ভোজবাজি! আম্মি! আম্মিকে কিছু জানানো হয়নি! আম্মি খুঁজছে না তো ওকে? আবার অবান্তর ভাবনা।

প্রথম যেদিন এই সংগঠনের লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল, কাঁধে স্কুল ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে সবুজ ডায়েরি। নিজেকে খাঁচায় বন্দি পাখির মত মনে হচ্ছিল। এরা বোধহয় জানতো ওর প্রাণভোমরার নাম শামিমা।

ওর আম্মি। জায়েদ জানে আম্মির রোজগারের পথ বড় পাথুরে। রোজ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় মায়ের আত্মা। শুধু জায়েদকে সুস্থ জীবন দেওয়ার লক্ষ্যে। জায়েদ পারে না আম্মিকে সুস্থ জীবন দিতে?

জায়েদ একটু সময় নিয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল ওর। মায়ের জীবনের মসৃণ পথ খুঁজে দিতে হবে। তাই 'হ্যাঁ' বলেছিল। বদলে আম্মির নিরাপদ আশ্রয়, সম্মানজনক জীবনের প্রতিশ্রুতি। এরা কথা দিয়েছিল জায়েদকে। আর জায়েদ নিজেকে। 'জিহাদ'-এর খাতায় নাম লিখিয়েছে ও। তারপর থেকেই কবিতারা ছেড়ে গেছে ওকে। আয়নায় মুখ দেখে না জায়েদ। 'দেশদ্রোহী'! শব্দটা কুরে কুরে খায় ওকে। দেশ মানে কি? নিজেকে প্রশ্ন করে জায়েদ? বিনিদ্র রাত! 'ইচ্ছে' নামের শব্দটা বিলীন হয়ে যায় এমন পথে হাঁটা! উত্তর খুঁজে পায়না পনের বছরের কিশোর। ও জানে ওর দেশ 'আম্মি'। তার আত্মা যন্ত্রণাক্লিষ্ট। রক্ষা করতে হবে জায়েদকে। আম্মির ক্লেশহীন হাসির পিছনে লুকিয়ে থাকা নীরব কান্না অসহ্য লাগে ওর। কতদিন ওরা একে অপরের দিকে তাকায় না! আম্মিও কি বুঝতে পারে সব?

সব যন্ত্র এসে গেছে। আই.ই.ডি ভরা হবে ওর শরীরে। একটা স্প্রিং-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে বোমার রসদ সক্রিয় করার ব্যবস্থা। এমন অনেক 'জায়েদ'-এর দীর্ঘশ্বাস রয়েছে এই ঘরে। ওরা জামা পরাচ্ছে। জামার ভেতর সবটা গোছানো থাকবে। 'মানুষ' থেকে 'মানব-বোমা'। হাত তুললেই স্প্রিং-এ ধাক্কা। বিস্ফোরণ। ছিন্ন ভিন্ন হবে কতগুলো শরীর। বিনিময়ে আম্মি পাবে সুস্থ জীবন। নিরাপদ আশ্রয়। শান্তিতে চোখ বোজে জায়েদ।

৪ তিরতিরে হাওয়ায় উড়ছে ডায়েরির পাতাগুলো। অনুভূতিমালা। ছেলেটা লিখতে বড় ভালোবাসতো। ক্যাম্পের বাইরে আকাশের নিচে বসে আছে শামিমা। রাতের দিকে আফগানিস্তানের এই গ্রামে বড় শিরশিরে হাওয়া দেয়। জায়েদের শরীরের অংশগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সবুজ ডায়রিটা অদ্ভুতভাবে অক্ষত ছিল। শামিমা যখন দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল, সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। কয়েক দিনের মধ্যেই শামিমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। ও জানে। তাই দূর থেকে ছেলের শরীরের অংশ খুঁজতে গিয়েছিল। একটা যদি টুকরো পাওয়া যেত? স্মৃতি? ছেলের শরীরের কোন একটা অক্ষত টুকরো আঁকড়ে বাঁচতে হবে তো? ওকে বাঁচানোর জন্যই তো জায়েদের এই আত্ম-বলিদান। জায়েদ বোধহয়য় বুঝতে পেরেছিল সবটা! শামিমার জীবনের কঠিন পথের খোঁজে পেয়েছিল? সবুজ ডায়েরিতে সব উত্তর থাকবে নিশ্চয়ই। শামিমা জেলে বসেই না হয় পড়বে। কাল নিজেই গিয়ে না হয় ধরা দেবে। তার আগে একটা রাত। ছেলের ডায়েরি, স্মৃতি আর মা! জায়েদের স্বপ্ন, সহিষ্ণুতা, ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষাদের একবার ছুঁয়ে দেখতে হবে একা একা। শামিমা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে

চলল।

পায়েল চ্যাটার্জি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। পেশাগত সূত্রে লেখালিখি করতে হয়। তবে তার বাইরে আত্মার টান শব্দের সঙ্গে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত।

মোদির ভালোবাসা
অনুপম লাহিড়ী

মোদি কেন বিয়ে করেনি, সেই নিয়ে কেষ্টদার চায়ের দোকানে গরম আলোচনা চলছে। অনেকরকম গল্প। কেউ বলে মোদি মাঙ্গলিক, তাই বিয়ে হয়নি। আবার কেউ বলে মোদি তার কলেজের একজনকে ভালোবাসতো, আর তাদের বাড়িতে আপত্তি থাকায় তাদের বিয়ে হয়নি। আবার কেউ বলে মোদি নাকি পড়াশুনা করতে করতে আর সমাজ সেবা করতে করতে সময় পায়নি, সময় পেলেই করে ফেলবে। বয়সতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার একজন বললো যে মোদির নাকি বাল্যবিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মতের অমিল থাকায় কোনদিন একসাথে থাকেনি, কিন্তু আইনের কাছে মোদি বিবাহিত।
গরম চা, লেড়ো বিস্কুট আর সিগারেটের ধোঁয়ায় আলোচনা জমে উঠেছে।

মোদি কেনো বিয়ে করেনি থেকে মোদির বাড়ির কার কার বিয়ে হয়েছে বা কার কার বিয়ে হতে পারে, সবরকম আলোচনাই চলছে।

আমাদের ৬৭ বছরের অবিবাহিত মোদিকে নিয়ে আলোচনা যখন গরম, ঠিক তখনি কেষ্টদার দোকানের সামনে একটা রিক্সা এসে দাঁড়ালো। রিক্সাতে এক নববিবাহিত দম্পতি; মহিলা কেষ্টদাকে ২ কাপ চা আর চারটে বিস্কুট ওনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে কেষ্টদার দোকানের সবাইকে তাক লাগিয়ে রিক্সা নিয়ে সামনের গলিতে ঢুকে পড়লেন।

রিক্সাতে আমাদের পাড়ার মণিদীপা দি, ছোট্ট করে মো-দি, আজ সময় পেয়েই বিয়ে করে ফেলেছেন, আরে বয়সতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

আনুপম লাহিড়ী নিজেকে দিল্লীর বাঙালি বলে পরিচয় দেন আর ওনার বিশেষত হল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। মেক্সিসের সমস্ত মোষ তাড়িয়ে, আপাতত উনি ইউটিকা শহরের জলাভূমিতে মোষ খুঁজে বেড়ান আর দেকতে পেলেই তাড়া করেন। ***

শিউলির ঘ্রাণ

অনন্যা দাশ

এই সময়টায় মনটা বড্ড অন্য রকম হয়ে যায় জয়ার। শিউলির গন্ধ, কাশের দোল খাওয়া বুকের ভিতর একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় সেই তিরিশ বছর আগেকার দিনটার কথা। সেই যখন গ্রামের মেয়ে হতদরিদ্র জয়াকে রোজ দু ক্রোশ দূরের পথ পেরিয়ে স্কুলে যেতে হত। পড়াশোনা করার অদম্য ইচ্ছে ছিল জয়ার তাই অতটা কষ্ট করত সে রোজ। আত্মীয় প্রতিবেশী সবাই বাবাকে কেবল বলত, "কী হবে মেয়েকে অত পড়িয়ে? ওর বিয়ে দিয়ে দাও!"

বাবা শুধু হুঁ-হাঁ তে উত্তর দিতেন। বাংলাদেশ থেকে এদেশে পার হয়ে এসে সেই যে বিছানা নিয়েছিলেন আর কিছু করে উঠতে পারেননি শুধু তিনটে ছেলেমেয়েকে জন্ম দেওয়া ছাড়া। মা-ই সংসারের ঘানি টানতেন। ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে তখন জয়া। বিজ্ঞান পড়ার মতন সাধ্যি তার ছিল না। কোনমতে আর্টস নিয়ে পড়ছিল, তাও বই কেনার ক্ষমতা ছিল না। সেই তখনই ওদের ক্লাসে শহর থেকে পড়তে এল আদিত্য। ওর বাবার বদলি হয়েছিলেন গ্রামের ব্যাঙ্কে তাই সে এসেছিল। সে ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। নামের মতনই দ্যুতি তার। সব কিছুতেই সে ভালো, দারুণ ক্রিকেট খেলত, ক্লাসে ফার্স্ট হত, ভালো গান গাইত। ক্লাসের সব মেয়েরা আদিত্য বলতে অজ্ঞান। তখনকার দিনে ওদের গ্রামের স্কুলে ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে পড়লে কী হবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ হত না। এখন জয়ার মনে হয় সেই না বলা কথাগুলোই হয়তো বেশি রোমাঞ্চকর ছিল। সবার মতন সেও হাঁ করে দেখত আদিত্যকে। একসঙ্গে ইংরেজি আর বাংলা ক্লাস হত যখন তখন। জয়া জানত আদিত্য ওর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে তাও ভালো লাগা তো আর সেই সব নিয়ম মেনে হয় না।

সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে জয়ার। পুজোর ছুটির আগের দিনটা। বাতাসে তখন এই রকম শিউলির গন্ধ, কাশের বনে হাওয়ার দোলা। সেই কাশ বন দিয়ে যেতে গিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল জয়া। ভালো রকম চোট পেয়েছিল পায়ে। প্রচন্ড ব্যথার মধ্যে কোন রকমে পাটাকে টানতে টানতে রাস্তার ধারে এসে পড়েছিল। সেই রাস্তা দিয়েই সাইকেল করে যাচ্ছিল আদিত্য। আশ্চর্য কান্ড, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আদিত্য, বলেছিল, "আরে জয়া না? তুই তো আমাদের ক্লাসে পড়িস। তোকে দেখেছি বাংলা ক্লাসে। কী হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ি যাবি না?"

জয়া লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল, "পা মচকে গেছে, হাঁটতে পারছি না।"

"ও তাই? সাইকেলে বসতে পারবি? মানে সামনের হান্ডেলে? তাহলে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। পারবি?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল জয়া। তারপর কী মনে হতে বলেছিল, "আমার বাড়ি কিন্তু অনেক দূরে।"

"আমি কী হেঁটে যাচ্ছি নাকি? যাবো তো সাইকেলে! নে উঠে বস।"

সারা রাস্তা ধরে অনর্গল গল্প করতে করতে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল আদিত্য। আচ্ছন্নের মতন কেটেছিল সেই সময়টা জয়ার। সে যেন এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হয়তো বয়সটাই সেই রকম ছিল। কে জানে। একটুকু ছোঁওয়াতেই মনে হত বুঝিবা স্বর্গের কাছাকাছি চলে গেছে সে। সেই ঘটনাটার পর আর তেমন যে কথা হয়েছিল ওদের মধ্যে তাও নয় কিন্তু জয়ার মনে জন্মেছিল অরুণ এক আলো। সেই দিনের

ঘটনাটার কথা সে কাউকে বলেনি। তার মনে হয়েছিল সেই ঘটনাটা, সেই স্মৃতিটা শুধু তার, আর কারো সঙ্গে সেই আনন্দটা ভাগ করে নিতে চায় না সে।

"দিদিমণি, ও জয়া দিদিমণি?" সুখেনের ডাকে বর্তমানে ফিরে এল জয়া। এই সময়টাতে মাঝে মাঝে ওই ঘটনাটা মনে এসে ওকে আনমনা করে দেয়।

"কী হয়েছে?"

"কেষ্ট ব্যাটা আজকে এসেছিল গো স্কুলে। হেডস্যার আর অন্য টিচারদের কী সব বলছিল ফিসফিস করে। আমার তাই মনে হল তোমাকে বলে দিই!"

"ভাল করেছিস। আমি জিজ্ঞেস করে নেবখন। ব্যাটা কোন কাজের নয় আর আমার সুখ শান্তি নষ্ট করতে চলে আসে। যাক তোর মেয়ে কেমন আছে?"

"ভালো আছে গো! তুমি সেদিন যে টাকাটা দিলে তাই দিয়ে ওকে জামা কিনে দিয়েছি। পুজোর সময় পরবে। বউ তোমার কাছে নিয়ে আসবে দেখাতে।"

"ঠিক আছে আসতে বলিস। এখন বাড়ি যা," বলে জয়া সুখেনকে বিদায় করল। ওদের স্কুলের স্টাফ সুখেন। জয়াই ওকে চাকরিটা করে দিয়েছে। সেই জন্যে সে জয়াকে খুব শ্রদ্ধা করে। বেচারার একটা পা খোঁড়া তাই কাজ পাচ্ছিল না।

সুখেনের বলা কথাটা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেষ্ট কেন এসেছিল কে জানে। অনেক কষ্টে সৃষ্টে পড়াশোনা শেষ করে স্কুলের চাকরিটা পেতে পেতে আর সংসারটাকে দাঁড় করাতে করাতেই তিরশের কোঠায় চলে গিয়েছিল বয়স। তখন বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না তার মোটেই তাও আত্মীয় স্বজন আর মার কথা শুনে রাজি হয়েছিল। কেষ্ট ছিল অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে কিন্তু কোন কাজ করত না। সবাই বলেছিল, "ওর আবার কাজের দরকার আছে নাকি? অত বিঘে জমি, অত পুকুর, হেসেখেলে চলে যায়।"

কথাটা যে কত বড় ভুল সেটা বিয়ের পর বুঝেছিল জয়া। ওর মাইনের পুরোটাই কেড়ে নিত কেষ্ট আর কেষ্টর মা। নিজের অসুস্থ মায়ের জন্যে ওষুধ পর্যন্ত কিনতে পারেনি তখন জয়া। ওদের অমতে একটা পয়সাও খরচা করলে তার ভাগ্যে জুটত লাথি, চড়, থাপ্পড় আর গালাগাল। তাও যদি চরিত্রটা ঠিক হত জয়া হয়তো সহ্য করে নিত কিন্তু সেখানেও গোলমাল। বিধবা বউদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল কেষ্টর। সেটা জানতে পারার পর আর ওখানে থাকেনি জয়া। এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল। ওর গয়না, জামাকাপড়, ওর কেনা আসবাব পত্র সব কিছু নিয়ে নিয়েছিল ওরা। ভাগ্যিস তবু স্কুলের চাকরিটা ছিল। সেটাকে আঁকড়ে ধরেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিল জয়া। বিয়েটাকে ভেঙ্গে দিতে অসুবিধা হয়নি।

তাও পয়সার লোভ ভুলতে পারে না কেষ্ট। মাঝে মাঝেই জয়ার স্কুলে চলে আসে। অন্যান্য টিচারদের এটা সেটা বলে ওর নামে। আবার মাঝে মাঝে বলে, "ওকে বলবেন যেন আমার কাছে ফিরে আসে। ওকে রানি করে রাখব!"

জয়া আর ওর ভালো মন্দ কোন কথাতেই কান দেয় না। শরীরের ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেলে কী হবে মনের ঘা তো দগদগেই আছে। স্কুলের টিচারদের আবার ধরে ধরে বোঝাতে হবে যে সে ভাল আছে। কেষ্টর কাছে ফিরে যাওয়ার তার কোন বাসনা নেই।

সত্যিই সে ভালই আছে। নিজের জন্যে একটা বাড়ি করেছে। দুই ভাইয়ের পরিবারকেও মোটামুটি দাঁড় করাতে পেরেছে। মা গত হয়েছেন কিন্তু তার আগে ওর তৈরি বাড়িটা দেখে যেতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে শুধু একটু একা লাগে। তখন আজকের মতন ফেসবুকটা খুলে বসে সে।

নিজের বন্ধু তালিকার থেকে একজনের প্রোফাইলে চলে যায়। আদিত্য শেখর সেনগুপ্ত এখন একটা বিশাল চাকরি করে। ঘরে তার সুন্দর টুকটুকে বউ, দুটো ফুটফুটে বাচ্চা। জয়া ঘুরে ঘুরে সব দেখে। ফোনের দোকানের ছেলেটা ওকে সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছে। অবশ্য আদিত্যকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। ভাগ্যিস রত্না আর পার্থ মিলে রিইউনিয়ান ইত্যাদি করার কথা ভাবছিল বলে সবাইকে খুঁজে বার করেছিল। রিইউনিয়ান আর শেষমেশ হয়ে ওঠেনি কিন্তু ওদের ব্যাচের অনেককেই খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তারা এখন বন্ধু।

জয়া খুব একটা কথা বলে না কারো সঙ্গেই কিন্তু সব কিছু দেখে। অন্যদের সবার সুন্দর আনন্দময় জীবন দেখতেও তার ভালো লাগে। তারপর একদিন আদিত্যই ওকে দেখতে পেয়ে মেসেজ করেছিল, "কেমন আছিস জয়া? এতদিন পর তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে। ভালো আছিস তো?"

কী বলবে জয়া, বলেছিল, "হ্যাঁ, ভালোই আছি। স্কুলে পড়াই, চলে যায়।"

এই ভাবেই মাঝে মাঝে টুকটাক কথা হয়। আজ দেখল আদিত্য তার প্রোফাইলের ছবিটা বদলেছে। একটা কাশবনের ছবি দিয়েছে। অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে গেল জয়ার মন। কাশবন দেখলে কী আদিত্যর মনে পড়ে সেই দিনটার কথা? কে জানে।

কাল সকালে ঝরে পড়বে শিশির আর তার সঙ্গে কিছু শিউলি। সেই গন্ধ আর কাশের দোলা নিয়েই ভুলে থাকবে তার একাকী মন।

অনন্যা দাশ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের হার্শি-তে বাস করেন এবং পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা গল্প এবং উপন্যাস কলকাতার প্রায় সব নামকরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কুষ্ঠি বিচার।

সুদীপ সরকার

আর ঠিক দুমাস উনিশ দিন, কুর্চি চব্বিশ পূর্ণ করে পঁচিশে পা দেবে। হলদেটে হয়ে যাওয়া লম্বা একফালি কাগজের টুকরোটা ভাজ করে দরকারি কিছু কাগজপত্রের সাথে ফোল্ডারে ঢুকিয়ে রাখল অবনিশ। দিন কয়েক আগে আচমকাই অন্যান্য কিছু কাগজ ঘাটাঘাটি করতে করতে হলদে হয়ে যাওয়া তামাদি কাগজটা খুঁজে পেয়েছে অবনিশ। সেই কোন কালে সুধাকর ঘোষাল করে দিয়েছিল এই কুষ্ঠি। কুর্চি তখন নেহাতই ছেলেমানুষ, বড় জোর বছর পাঁচেক হবে। অবনিশের ছোট পিসির ভাশুর সুধাকর জ্যাঠা তখন কুষ্ঠি বিচার ছেড়ে দিয়েছেন। বয়েস প্রায় আশি ছুঁইছুঁই। অবনিশকে বিশেষ স্নেহ করতেন ভদ্রলোক। ছোট পিসির জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত কুর্চির কুষ্ঠি বিচার করে দিয়েছিলেন। মুক্তোর মত হাতের লেখা পরিষ্কার করে পড়া যায় এত দিন পরেও। অবনিশকে ডেকে কাঁপা কাঁপা গলায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওনার বিচার। গ্রহ নক্ষত্র আর রাশি চক্রের অবস্থান কি ভাবে জাতিকার জীবনে কু প্রভাব বিস্তার করতে পারে, শুভ সময় কখন, শুভ রঙ কোনটা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাধ্য মত বুঝিয়েছিলেন অবনিশকে।

এত দিন সেসব বিষয়ে খুব কিছু মনেও ছিল না অবনিশের। তাছাড়া সুচরিতা এসব একেবারেই বিশ্বাস করে না। কুর্চিও হয়েছে মায়ের মত, এসব নিয়ে ভাবার ফুরসৎ নেই ওর। কিন্তু হঠাৎ করে হাতে আসা কুষ্ঠির কাগজ থানা অবনিশের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম, কন্যা রাশির কুর্চির খারাপ সময় শুরু হওয়ার কথা পঁচিশ বছর থেকে। বুধ আর কেতুর কি একটা অবস্থান গত ব্যাপারের কথা বলেছিলেন সুধাকর জ্যাঠা। তবে এক থেকে দের বছরের মধ্যেই আবার ভালো সময় ফিরবে। আন্ডারলাইন করা জায়গাটা বার তিনেক ভালো করে পরে দেখেছে অবনিশ। পরিষ্কার করে লেখা আছে, "বিবাহ ঘটিত জটিলতার সম্ভাবনা থেকে পিতার সঙ্গে জাতিকার মতবিরোধ এবং জাতিকার পদস্খলন।"

বুকের বা দিকটা চিনচিন করে উঠল অকস্মাৎ। অনেক দিন ধরেই অবনিশ লক্ষ্য করছে, কুর্চি কিছু বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়েছে। বিশেষ করে ওই ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাঞ্জাবী ছোকরাটা, লম্বা লম্বা চুল, সিনেমার জব চারনকের মত লম্বা জুলপি, চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। অবনিশ নিশ্চিত, ব্যাটা ড্রাগ নেয়, নয়ত নেশা ভাঙ করে। বাড়িতে প্রায়ই আসে কুর্চির সাথে, সঙ্গে অবিশ্যি আরো দুটি মেয়ে আসে। এদিকে সুচরিতার তো এদের দেখলেই আত্মহারা প্রাণ, "সবাই কিন্তু খেয়ে যাবে", টিপিকাল পুরনো দিনের ফিল্মি মা যেন। আরে, মেয়ে প্রেম করছে না কি করছে মা খেয়াল রাখবে না তো কে রাখবে? আজকালকার ছেলে মেয়ে, চট করে কিছু বলাও যায় না, অবনিশ কিছু বলার চেষ্টা করলেও হেসে উড়িয়ে দেবে মা মেয়েতে।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল বুদ্ধি করে, "হ্যাঁ রে মা, তোর বিষয় এনথ্রপলজি আর ওই গুরমিত না কি নাম, ও পরে ইঞ্জিনিয়ারিং, তোদের বন্ধুত্ব হোল কি করে? ছেলেটা থাকেই বা কোথায়?" কুর্চি বলে বসল, "কেন বাপি? তুমি কি ভাবছ আমি গুরমিতের সাথে প্রেম করছি? সে সব কিছু না রে বাবা, আমার এরকম অনেক বন্ধু আছে।" আজকালকার ছেলে মেয়েদের মুখে কিছু আটকায় না, অবলীলায় বাপ কে এটা সেটা বলে দিতে দুবার ভাবে না। কুষ্ঠির ব্যাপারটা সুচরিতা আর কুর্চি দুজনকেই শুনিয়ে রেখেছে অবনিশ, আর কিই বা করতে পারে। মেয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, মাষ্টার ডিগ্রি করেছে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে, পিএচডি শুরু করেছে, সে এসব নিয়ে হাসাহাসি করলে কিই বা করার আছে!

সুচরিতাও তেমনই, এসব কুষ্ঠি বিচার, পামিস্ট্রি বা এস্ট্রলজিতে কোন বিশ্বাস নেই। ওর বিশ্বাস, ভালো মন্দ যা হবার নিজের নিয়মেই হবে, পাথর বা রত্ন মানুষের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, দুর্বল চিত্তের মানুষরাই এই বিদ্যা চর্চা টিকিয়ে রেখেছে। একটা রুবি ধারণের উপদেশ ছিল সুধাকর জ্যাঠার বিচারে, কিন্তু কুর্চি কিছুতেই রাজি হয় নি রত্ন খচিত পাথরের আংটি পড়তে। ওর ওই এক কথা, "পনেরো কুড়ি বছর আগে তোমার সুধাকর জ্যাঠা কি বলেছেন তার বাস্তবতা কি? আমি এমন কিছু করব না যাতে আমার নিজের ক্ষতি হয়।"

অবনিশের মন মানে না। সুধাকর তো আর যে সে মানুষ ছিলেন না। এরা কি জানে! ছোট পিসির আহিরিটোলার বাড়িতে তখন খুবই যাতায়াত ছিল অবনিশের। সুধাকর জ্যাঠার যশ বা খ্যাতি ভালোই ছড়িয়েছিল। নামি দামি লোকের কাছে বেশ সমাদর ছিল ওনার। অবনিশের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু দেবী প্রসাদ দন্ডপাত একদিন খুব করে ধরল অবনিশকে, ছোট ভাই কালী প্রসাদ একদম বদ সঙ্গে পড়েছে, ওকে কি করে সুস্থ জীবনে ফেরানো যায়, এক বারটি ওই সুধাকর ঘোষালের কাছে নিয়ে চল, তোর আত্মীয় মানুষ, সহজে যোগাযোগ করা যাবে। অবনিশ দুবার ভাবেনি, নিয়ে গিয়েছিল সুধাকর জ্যাঠার কাছে। জন্ম সময়, সাল বার মিলিয়ে জ্যাঠা আশ্বাস দিয়েছিলেন, "এ ছেলে দামাল বটে তবে বদ সঙ্গ ছাড়াতে গেলে একটা পিথ পোখরাজ আর পলা ধারণ করতে হবে। এ ছেলে জীবনে উন্নতি করবে আর আগুন নিয়ে খেলবে।" আঁতকে উঠে দেবী প্রসাদ জিজ্ঞেস করেছিল, "তার মানে কি সেই পিস্তল বোমা নিয়েই ঘুরবে নাকি?" সুধাকর জ্যাঠা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "আগুন নিয়ে খেলা মানেই কি আগ্নেয়াস্ত্র? আমি যা বুঝলাম বললাম, বাকিটা সময় বলবে।" সত্যি সত্যি কালী প্রসাদ মাস কয়েকের মধ্যে বদ সঙ্গ ছেড়ে সুস্থ জীবনে ফিরেছিল। পরে ব্যবসা শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেশলাই এর কারখানা খুলে বসল। এখনও কেপি ম্যাচেস দিব্যি ব্যবসা করছে। বোধহয় ছেলেরা দায়িত্ব নিয়েছে। অবনিশ সুচরিতা বা কুর্চিকে এই গল্প শুনিয়ে ওদের মনে সম্ভ্রম জাগ্রত করতে পারেনি, "আগুন নিয়ে খেলা মানে দেশলাই এর কারখানা, ভালো তো", হেসেছে মা মেয়েতে।

ডিসেম্বরের শুরুতেই এবার কোলকাতায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীত কাতুরে অবনিশ অফিস শেষ করেই বাড়ির পথ ধরে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে। কোলকাতায় যদিও মানুষের ভীরে আর গাড়িঘোড়ার আধিক্যে ঠাণ্ডা মালুম হয় না সেভাবে। আদ্যন্ত ঘর কুনো অবনিশ বাড়ি ফিরে নিজের পরিসরে গুছিয়ে বসতে পারলেই খুশি। আজ অবনিশ বিকেল থাকতে থাকতেই ফিরেছে। ঠাণ্ডার দিন, অবনিশ একটু আগে ফিরেছে, এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু মনে হোল না সুচরিতার; তবে খানিকটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে অবনিশের হাবেভাবে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মুখ খুলল অবনিশ, "মেয়ে একটা অঘটন ঘটাবে বলে দিলাম, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।" সুচরিতা বিরক্তি প্রকাশ করল, "আবার তোমার সেই খারাপ সময় এর বৃত্তান্ত নিয়ে পড়লে? মেয়ে বড় হয়েছে, যদি কিছু করে তো নিজের ভালো মন্দ বুঝেই করবে, তুমি খামোখা এত চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়ছ কেন?"

"হ্যাঁ অ-জাত কু-জাতে বিয়ে করবে বলে রাখলাম। ওই গুরমিত না কি যেন, পাঞ্জাবী ছোকরা টার সাথে দেখলাম তোমার কন্যা ফ্লুরিসে টেবিল আলো করে বসে আছে। আমাদের সুবিমল একটা এরিয়ারের টাকা পেয়েছে গত সপ্তাহে, ট্রিট দেবে বলেছিল, তাই জনা চারেক মিলে লাঞ্চ আওয়ারে গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রীট ফ্লুরিস এ। কোনের একটি টেবিলে দেখলাম কুর্চি আর ওই ব্যাটা, সঙ্গে অবশ্য আরও একটি ছেলে ছিল, বেশ সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত ঘরের মনে হয়। তেনারা আমাকে দেখননি, গল্পে মশগুল ছিল। খানিক পরে বেরিয়ে গেল দেখলাম।" সুচরিতা একটুও আশ্চর্য না হয়ে বলল, "এতে দোষের কি দেখলে? ওরা তো মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক খেতে যায়, আমাদের সময় আমরা কি যেতাম না মাঝে মধ্যে রেস্তোঁরায় খেতে?" অবনিশ গজগজ করতে করতে বলল, "আসুক কুর্চি জিজ্ঞেস করব। এসব বেজাতে বিয়ে সাদি কিন্তু মেনে নেব না।" সুচরিতা উঠে গেল, বলতে বলতে গেল, "বুড়ো হয়েছ বোঝা যাচ্ছে। সেকেলে লোক একটা।"

অবনিশের বক্তব্য শুনে কুর্চি ফিক করে হেসে বলল, "বাবা, আমরা তো মাঝে মাঝেই কয়েকজন মিলে খেতে যাই, আজকে সীমা, অহনা ছিল না তাই। আর গুরমিত ছাড়াও তো অনির্বাণ ছিল। তবে তুমি যে ভাবে তোমার সুধাকর জ্যাঠার ভবিষ্যৎ বানী সত্যি করার জন্য উঠে পরে লেগেছ, সেটা বোধহয় ফলেই যাবে।" অবনিশ রেগে গিয়েও ঢোক গিলে বলল, "দেখ, ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আর যাই করিস, ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে বেজাতে বিয়ে করিস না।" কুর্চি আবার ফিক করে হাসল, "আগুন নিয়ে খেলা মানে যদি দেশলাই এর কারখানা হয় তাহলে পদস্খলন মানে পা ভাঙ্গাও হতে পারে, কি বল বাবা? " অবনিশ বুঝল, মেয়ের ভাবগতিকে কোন পরিবর্তন হবার নয়।

অবনিশ সারা বছরই গায়ে কিছু একটা চাপিয়ে শোয়, এখন দুটো কম্বল লাগে শীত ঠেকাতে। সুচরিতার একটা কম্বলেই চলে যায়। শীতের আমেজ সারা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে হাত পা টান টান করে পাশ ফিরল অবনিশ। মুখের কাছ থেকে কম্বল সরিয়ে বলল, "কুর্চি কে নিয়ে এবার কিন্তু ভাবার সময় হয়েছে, পিএচডি শুরু করেছে তাও বছর ঘুরতে চলল, ভালো ছেলে পাওয়া তো মুখের কথা নয়।" সুচরিতা বলল, "আজকাল ছাব্বিশ সাতাশের আগে কেউ বিয়ে করে না, তাছাড়া কুর্চি নিজে রাজি না হলে আমি জোর করতে চাই না। ওর নিজের ক্যারিয়ার, নিজের পছন্দ অপছন্দ, সেসব না ভেবে কিছু করার পক্ষপাতী নই আমি। আমার বাবা যেমন স্কুলের চাকরিতে ঢুকতে না দিয়ে একটা ভুলভাল লোকের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, তেমন আমি আমার মেয়ের সাথে করতে চাই না।"

অবনিশ প্রবল শীতের কাঁপুনি উপেক্ষা করেও কম্বল সরিয়ে উঠে বসল, চিৎকার চেঁচামেচি করার বয়েস নেই বলে আস্তে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, "এটা কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়, আমি যদি ভুলভাল হয়ে থাকি তাহলে তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করলেন কি করে? উকিল মানুষ, ভালো রত্নটি ঠিক বেছে নিয়েছিলেন, বরঞ্চ তোমার রং চাপা হলেও, নাক বেশ খানিকটা ট্যাপা হলেও আমার মা কিন্তু সেসব আমল দেন নি, এক কাপড়ে তোমাকে নিয়ে এসেছেন।" সুচরিতা প্রত্যুত্তর করার আগেই অবনিশ ওকে থামিয়ে বলল, "জোকস এপার, কুর্চি কে নিয়ে আমার যা মনোভাব বললাম; এবার তুমি যা ভালো বোঝ।"

কুর্চি আগের দিন রাতেই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে, সকাল সকাল বেরোনোর প্রস্তুতি সাড়া। একটা এনজিও স্পনসরড প্রোজেক্টের ফিল্ড স্টাডির ব্যাপারে দিন কয়েকের জন্য ওরা পুরুলিয়া যাচ্ছে। দুজন রিসার্চ ফেলো আর ওদের গাইড প্রফেসর রায় যাচ্ছেন সাথে। পুরুলিয়ার আদি জনজাতি যেমন বিরহোর বা শবর দের জীবন যাত্রা, তাঁদের জীবন শৈলী নিয়ে চর্চা করাই উদ্দেশ্য এই প্রজেক্টের। এর আগেও ওরা জলপাইগুড়ির টোটো পাড়ায় সার্ভের কাজ করেছে। আদিম জনজাতি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় কে কেন্দ্র করে questionnaire তৈরি করতে হয়, সেসব নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত ছিল কুর্চি গত কয়েকটা দিন। সামান্য কিছুটা অন্যমনস্কতা নজর এড়ায়নি সুচরিতারও। সকাল সকাল গাড়ি এসে পিক আপ করল কুর্চিকে। অন্য দুজন জমায়েত হয়েছে প্রফেসর রায়ের বাড়িতে, সেখান থেকে রওনা হতে হতে সকাল নটা। দুর্গাপুর আসানসোল হয়ে পুরুলিয়া পৌঁছতে প্রায় ঘন্টা পাঁচেক বা কিছু বেশি। বারোটার দিকে কুর্চির হোয়াটসএপ মেসেজ পেল সুচরিতাঃ "দুর্গাপুর পেড়িয়ে আসানসোল ঢুকছি, কোন সমস্যা নেই। আমার টেবিলে একটা চিঠি রেখে এসেছি, পড়েনিও, প্লিজ মা, যা লিখেছি সেসব নিয়ে ফেরার পর কথা বোল, পুরুলিয়া পৌঁছে মেসেজ করব।"

সুচরিতা অস্থির হয়ে পড়ল ভিতরে ভিতরে, কুর্চির টেবিলে রাখা দুপাতার চিঠি খানা নিয়েই ছুটল অবনিশের কাছে। রবিবার বলে অবনিশ বাড়িতেই আছে, এমনিতেও কুর্চি বাইরে গেলে অবনিশ সেদিনটা ছুটি নিয়ে বাড়িতেই থাকে, মেয়েকে সিঅফ না করলে খচখচানি থেকে যায়। সুচরিতা রেখে ঢেকে কিছু বলতে পারল

না, উত্তেজনা আর অজানা আশঙ্কায় কাপতে কাপতে বলল, "কুর্চি মেসেজ করে জানাল একটা নাকি চিঠি রেখে গেছে আমাদের জন্য, আমি খুলিনি, প্লিজ পড়ে দেখ কি লিখেছে।" অবনিশ মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠল, "সেই অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়ল মেয়েটা, এত করে বললাম, আমার কথা শুনলে না। নিশ্চয়ই ওই পাইয়ার ব্যাটাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে।" সুচরিতা বিড়বিড় করে বলল, "কুর্চি যথেষ্ট রুচিশীল আর দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মেয়ে, কোন ভুল করবে না, আমার বিশ্বাস। প্লিজ চিঠিটা পড়, কি লিখেছে শুনি।" অবনিশ উত্তেজিত হাতে ভাজ করা কাগজের পাতা দুটো খুলে ধরল চোখের সামনে। গলা খাঁকারি দিয়ে সুচরিতাকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল

শ্রীচরণেষু মা বাবা,

জীবনে প্রথম বার তোমাদের কিছু বলার জন্য চিঠি লিখলাম। আসলে সামনাসামনি বসে কথা বলতে গেলে বোধহয় সব কথা গুছিয়ে বলতে পারতাম না, সহজাত রুচিবোধ আর সহবৎ হয়ত সব কিছু বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, তাই লিখে জানানর কথা ভাবলাম। মূল বক্তব্যে আসার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলি তোমাদের, যদিও এর খুব একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়। বিবিধ বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সূত্রে বাবার হয়ত এই গল্প অজানা নয়, তবুও বলি। প্রায় আটশো থেকে হাজার বছর আগে, বঙ্গ দেশে আদিসুর নামক এক হিন্দু রাজা ছিলেন। কারো মতে ইনি বল্লাল সেন এর পূর্ব পুরুষ। ইনি তৎকালীন কনৌজ থেকে পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন হিন্দু ধর্মের কৌলীন্য পুনরুদ্ধার করতে। এঁদের সঙ্গে আবার এসেছিলেন পাঁচজন অমাত্য বিশেষ যারা ছিলেন কায়স্থ। এই পাঁচ ব্রাহ্মণ পরবর্তী কালে হয়ে বসলেন কুলীন ব্রাহ্মণ আর পাঁচজন অমাত্যের চার জন যথাক্রমে ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র হয়ে বসলেন কুলীন কায়স্থ। বেকে বসলেন পঞ্চম জন। তিনি বললেন, আমি কারো নীচে নই, অমাত্যও নই, বরং আমার অবস্থান সবার উপড়ে, এমনকি ওই কুলীন ব্রাহ্মণ দের থেকেও, আমি শুধুই সঙ্গে এসেছিলাম। তার পদবি ছিল দত্ত। তিনি বললেন, "দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে।" সেই কারণে দত্তরা আর কুলীন কায়স্থ হিসেবেও মান্যতা পেল না। গুরমিত এর পদবিও দত্ত, যদিও ওরা বলে দত আর বাঙালিদের দত্ত আর পাঞ্জাবীদের দত এক কিনা আমি সঠিক বলতে পারব না। এই গল্প থেকে অন্তত এটা আন্দাজ করা যায় যে হাজার বছর আগে শুরু হওয়া একটা প্রথা আমাদের সমাজে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক।

জন্ম সূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও আমার কোন বিশেষ গুন আছে বলে আমার মনে হয় না যার জন্যে ব্রাহ্মণত্ব জাহির করা যায়। যাই হোক, ভুমিকা শেষ করে এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। খুব সম্প্রতি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জীবনে প্রথমবার তোমাদের না জানিয়ে। আসলে বিয়ের কথা সে ভাবে কখনো মাথায় আসেনি, কিন্তু সুধাকর জ্যাঠার কুষ্ঠি বিচার সত্যি করে তোলার জন্যই কি না কে জানে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম। না, বাবা যেটা ভয় পেয়েছিলে সেটা নয়, গুরমিত আমার খুব ভালো বন্ধু। তবে যাকে নিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি, তাকেও তুমি সেদিন দেখেছ, দৈবাৎ, পার্ক স্ট্রীট ফ্লুরিসে। অনির্বাণ, অনির্বাণ দত্ত। ওর সাথে আলাপ ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তে বাঙলার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছে বছর খানেক হোল। প্রস্তাব টা ওর দিক থেকেই ছিল কিন্তু আমি মাথাতেই আনিনি। জানিনা কি ভাবে কি হয়ে গেল, সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম, বোধহয় ওই কুষ্ঠির বিচার সত্যি করে ফেলার তাগিদেই। যদিও বিয়ে নিয়ে এখনি আমরা কেউ ভাবছি না। অনির্বাণ নিজেও পিএচডি করছে। থিসিসের কাজ কিছুটা অগ্রসর না হলে অন্য কিছু ভাবার সময় নেই। অনির্বাণরা কায়স্থ কিন্তু কুলীন কায়স্থ নয়, তবে আদিসুরের কহিনীর প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণ দের থেকে কমও নয় ।

যাই হোক, জাতিকার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পিতার সাথে মতবিরোধ তাহলে হোলই আর পদস্খলন হোল কিনা কে জানে! পুরুলিয়া থেকে ফিরে অনির্বাণ কে একদিন বাড়িতে নিয়ে আসব, মনে হয় তোমাদের ও ভালো লাগবে। তোমাদের না জানিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে খুব দ্বিধার মধ্যে রয়েছি, তোমাদের সম্মতি না পেলে মানসিক দণ্ড কাটিয়ে উঠতে পারব না। পুরুলিয়া থেকে ফিরে কথা হবে, তখন যত ইচ্ছে বকাবকি কোর কিন্তু তোমাদের অপত্য স্নেহ আর প্রশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি শান্তিতে থাকতে পারব না। আজকে এই পর্যন্তই থাকল, এখনও কিছু গোছগাছ বাকি রয়েছে, সময় কম। সাবধানে থেক, তোমাদের কুর্চি।”

চিঠিটা ভাজ করে সুচরিতাকে দিল অবনিশ। দুজনের কারো মুখেই কোন কথা সরল না। খানিক পরে অবনিশ একটা লম্বা শ্বাস টেনে বলল, “সুধাকর জ্যাঠার গণনা ভুল হবে কেন! তবে ওই পাঞ্জাবী ব্যাটাচ্ছেলেকে বিয়ে করলে মেনে নিতাম না।” সুচরিতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, “সেটাই শান্তি, কি বল?”

“হ্যাঁ, অনির্বাণ ছেলেটি কিন্তু বেশ সুপুরুষ, এক ঝলক দেখে বেশ ভালোই লেগেছিল সেদিন।” অবনিশ উঠল, ফাইলের ভিতর থেকে হলদে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাগজটা বের করে খুলে ধরল চোখের সামনে, আন্ডার-লাইন করা যায়গাটা পড়ল একবার, তারপর ভাজ করে আবার রেখে দিল ফাইলের খাঁজে।

সুদীপ সরকার, সেন্ট জেভিয়ারস স্কুল এবং রহরা রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সরকারি চাকরিতে (রাজ্য সরকারি সিভিল সারভেন্ট) আসার পরে লেখালিখির শুরু। আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, সানন্দা ওয়েব ম্যাগ্যাজিন, পরবাস ওয়েবজিন, নবকল্লোল এবং নানা পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে মেদিনীপুর জেলায় কর্মরত।

প্রতিপালন

উস্রি দে

প্ল্যাটফরমে পৌঁছেই মালতি দেখল ট্রেন ঢুকছে । ভিড় ঠেলে লেডিস কামরার দিকে এগোল মালতি । কোনমতে জায়গা করে নিল দাঁড়াবার । ট্রেন চলতে শুরু করতেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা । কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখেছে এই দিনটার । অবশেষে সুযোগ এল । আর সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকুও দেরী করেনি মালতি । সুকুমার যেদিন রাতে এসে বলল মালিকের সাথে দুদিনের জন্য বিহারের কোথায় যেন জায়গাটায় যেতে হবে কাজে, শুনেই মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল । মুক্তি ! এই সময়ের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে । বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা – একবার, শুধু একবার! ঠিক কতদিন হল? মনে মনে হিসেব করে মালতি । তা প্রায় বছর দশেক তো হবেই । দশ বছর! তার মানে কত দিন, কত মাস! আচ্ছা, কেমন লাগবে , এই দীর্ঘ ব্যবধানের পর ? শরীরের ভেতর একটা শিহরণ খেলে গেল । ভাগ্যিস যোগাযোগ টা ছিল । সেটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে প্রমীলার জন্যই ।

কয়েক স্টেশন পরে ভিড় টা একটু কমলে হাঁপ ছাড়ল মালতি । একটা সিটের কোণায় একটু বসার জায়গাও হয়ে গেল । জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল । কয়েকদিন ধরেই মেঘের রাজত্ব চলছিল সারা আকাশ জুড়ে । আজ রোদ্দুর উঠেছে ঝকঝকে । মনে হয় কেউ যেন ঝুলঝাড়ু দিয়ে আকাশের মেঘ গুলোকে সরিয়ে দিয়েছে । ভাবতেই হাসি পেল মালতির । ট্রেনলাইনের ধার দিয়ে দুটো বাচ্চা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে স্কুল ব্যাগ পিঠে নিয়ে । লাল ফিতে দিয়ে বিনুনি বাঁধা । সবুজ স্কার্ট আর সাদা ব্লাউস । মালতিদের স্কুলেও এইরকমই ছিল ড্রেসটা । অর্ধেক দিন চুল বাঁধা নিয়ে একচোট লেগে যেত মায়ের সাথে ।মা কেন তাড়াতাড়ি করছে না, স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি । কি যেন নাম ছিল সেই ঝগড়ুটে মেয়েটার ! যে সবসময় কোন না কোন ছুতোয় কারোর না কারোর সাথে ঝগড়া বাঁধাত! সুস্মিতাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোর খিচুড়ি খাওয়া, ওফ, কি আনন্দটাই না হত । সরস্বতী পুজোর দিন ভোর বেলা স্নান সেরে শাড়ি পরে স্কুলে গিয়ে সক্কলে মিলে পুজোর যোগাড় করা, সত্যি কি দিন ছিল! জীবন টা যে এইরকম হয়ে যাবে, ভাবেই নি কোনদিন । ছেলেবেলাতেই যদি জীবন টা আটকে যেত , বেশ হত !

মা আজ এখনও আসছে না কেন? মনে মনে ছটফট করে সোনালি । আজ যে মা কে একটা দারুণ খবর দেওয়ার আছে! অবশ্য মা কোনোদিনই ভিজিটিং আওয়ার এ সবার মাঝে আসে না । বড়দির ঘরেই মা বসে থাকে । ও যখন ঢোকে , মা উঠে বড়দিকে নমস্কার করে ওকে নিয়ে যায় বড়দির ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে । ওখানে বসেই মায়ের সাথে যত কথা । ছোট থেকে এই বোর্ডিং স্কুলে এমনটাই দেখে আসছে সোনালি । ওর বন্ধুদের মা বাবারা যখন আসে, তাদের মাঝে মা আসে না । আর গ্রীষ্মের বা পুজোর ছুটির সময়, মা ওকে নিয়ে যায় বাড়িতে , যদিও সেই বাড়িতে মা থাকে না । কিন্তু সুনু মাসি থাকে । সুনু মাসি আর মেসোর সংসারে আর কেউ নেই । ওরা সোনালি কে খুবই স্নেহ করে । মা কেন ওখানে থাকে না, কোথায় থাকে ? মা কে জিগ্যেস করেও তেমন কোন সদুত্তর পায় নি সোনালি । তবে মা তখন প্রায় প্রতিদিন ই ওর কাছে আসে দেখা করতে । মা বলে, মায়ের নাকি অনেক কাজ! রোজ কাজ না করলে সোনালি কে বড় করে তুলবে কি করে! বাবাকে কখনও দেখেনি সোনালি । মা বলে, ও যখন ছোট ছিল, বাবা কোথায় হারিয়ে গেছে ! তবে, ইদানীং সোনালির মনে হয়, ওর মা যেন অন্যরকম মা, সবার থেকে আলাদা ! কিন্তু ঠিক কোথায় যে তফাৎ, ধরতে পারে না ।

স্টেশন গুলো পার হয়ে যাচ্ছে পরপর । বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায় মালতি । কিই বা বয়স তখন । সেই রাতটার বিভীষিকা ভুলতে পারে না । রাতে সাধারণত দশটার মধ্যে ফিরে আসত বাবা । শেয়ালদার ওখানে একটা দোকানে কাজ করত । সেদিন রাত একটা বেজে গেল, বাবা ফিরল না । সারারাত ধরে খোঁজ খোঁজ । ভোরের দিকে রেল পুলিশ থেকে খবর এল একজন মাঝবয়সী কাল রাতে লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েছে । দেহ শনাক্ত করতে গিয়ে মা অজ্ঞান হয়ে যায় । তারপর যা হয় ! ঠাকুমা সুদ্ধ ওদের চার ভাইবোন কে নিয়ে শুরু হল মায়ের জীবনধারণের সংগ্রাম । চার ভাইবোনের মধ্যে ওই ছিল বড় । পড়াশুনো বন্ধ । গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কতরকম কাজই যে করেছে মালতি । সতের পূর্ণ হতে না হতেই বিয়ে । সম্বন্ধ টা এনেছিল ওদেরই এক আত্মীয় । সুকুমার ড্রাইভারি করে খারাপ পয়সা কামায় না । ছোট দুটো ভাই আর মা, এই নিয়ে সংসার। প্রথম এসে বেশ ভালই লেগেছিল মালতির । কিন্তু কিছুদিন যেতেই ও বুঝতে পারলো সুকুমার খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির, একজন ধর্ষকামী ।

জোরে জোরে পা চালায় প্রমীলা । স্টেশনে পৌঁছতে হবে সময়ের আগেই । নয়তো ওকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে যেতে পারে মালতি । আজ আসলে হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে কিছুটা ।ওদিকে সোনা মা ও অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই । আজকাল একটুতেই তার অভিমান হয় খুব । অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে মানাতে হয় । বেশ কয়েকটা গল্পের বই আর ওর পছন্দের পেন কিনে নিয়েছে প্রমীলা । তিল তিল করে টাকা জমিয়ে রাখে সোনামায়ের জন্য । দিনের খাটুনি তো আছেই, রাতেও ইদানীং অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করে ও । এক একদিন শরীর আর চলেনা । তবু সোনা মার মুখটা মনে করেই ...। প্রতিদিনের রোজগারে আবার থাবা বসায় “গুরু” । ওইখানেই তো বিপদ ! বাড়তি রোজগার লুকিয়ে রাখতে হয় । সেখানেও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে! মেয়ের জন্য কিছু করার উপায় পর্যন্ত নেই! কি জীবন! মনে মনে ভাবে প্রমীলা । ছোট থেকেই তো ধাক্কা খেতে খেতে এ ঘাট ও ঘাট ঘুরতে ঘুরতে শেষমেশ এই ঠিকানায় এসে পৌঁছনো । জন্মলগ্নটাই অভিশপ্ত যে!

রোদটা বেশ চড়া হচ্ছে । সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর । প্রমীলার সাথে টোটো তে বসে মালতি সাগ্রহে জানতে চাইল –

“আর কতদূর?”

“বেশি দূর না “প্রমীলার সংক্ষিপ্ত উত্তর ।

দোকানপাট পেরিয়ে টোটো চলেছে সরু রাস্তা ধরে । মাঝে মাঝে দুয়েকটা বাড়ি ঘর । টোটো যত এগোচ্ছে , উত্তেজনায় ভেতরটা তিরতির করে কাঁপছে মালতির । অবশেষে এক জায়গায় টোটো টা থামতেই প্রমীলা মালতিকে ইশারা করল নামার জন্য । হেঁটে একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে একটা ছোট মাঠ । দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গা , যার মধ্যে কয়েকটা বিল্ডিং । অবাক চোখে সব দেখতে দেখতে প্রমীলার সাথে ভেতরে ঢুকল মালতি ।

বেশ কিছুক্ষণ হল প্রমীলা ঢুকেছে বড়দির ঘরে, মালতি কে বাইরে দাঁড়াতে বলে । মালতির বার বার চোখ চলে যাচ্ছে বড়দির ঘরের সবুজ রঙের পর্দাটার দিকে । এতক্ষণ লাগছে কেন ? কি করছে প্রমীলা? দোতলায় বড়দির ঘরের পাশে পর পর ঘরগুলোই যে ক্লাস রুম, এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারল মালতি । সামনে টানা বারান্দা । বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল মালতি উল্টো দিকের বিল্ডিং টা । ওটা নিশ্চয়ই হস্টেল । ওখানেই থাকে ছাত্রীরা । হঠাৎ ওর নজরে পরল একটা ন'দশ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে হেঁটে আসছে মাঠ পার হয়ে স্কুল বিল্ডিঙের দিকে । দোতলায় উঠে এল মেয়েটি, তারপর সোজা ঢুকে গেল বড়দির

ঘরে । বুক টা ঢিপঢিপ করছে মালতির । খানিকক্ষণ পরেই প্রমীলা বেরিয়ে এল সেই মেয়েটির হাত ধরে । মালতির দিকে তাকিয়ে বলল –

"এস সোনা মা, ইনি অনেক দূর থেকে এসেছেন তোমাকে দেখতে!"

সোনালি ততোক্ষণে বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মালতির দিকে ।

"এই আমাদের সোনালি, আজ খুব ভাল দিনে তুমি এলে মালতি । সোনা মা মাসিক পরীক্ষায় ক্লাসের মধ্যে প্রথম হয়েছে, জানো?" বলতে বলতে প্রমীলার চোখ দুটো চকচক করে উঠল । কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে উপহার গুলো বের করে সোনালিকে দিতেই সোনালির মুখে আনন্দের ছটা!

"জানো, বড়দি বলছিলেন, সোনালি ...। "

আর কোন কথাই কানে ঢুকছিল না মালতির ।স্মৃতির পর্দা সরাতেই একদম সামনে চলে এল দৃশ্যটা । হাসপাতাল থেকে সাতদিন হল বাড়ি ফিরেছে মালতি । শরীর খুব দুর্বল । গায়ে জ্বর । মাটিতে বিছানা । বিছানার এক পাশে শোয়ানো এক রত্তি মেয়েটা কেঁদেই চলেছে । খিদে পেয়েছে যে !

"কি হল কি? এত চেল্লাচ্ছে কেন? ইচ্ছে করে দিই ওটার গলা টিপে শেষ করে!"

বারান্দা থেকে সুকুমারের গলাটা হিস হিস করে ওঠে ।

"তকনই জানতুম, আমার কপালে কি আর নাতির মুক দেকার সুক আচে? অপয়া মেয়েছেলে একটা!"

শাশুড়ির তাৎক্ষণিক সঙ্গত । মালতি কোনমতে দেহটা টেনে নিয়ে যায় মেয়ের কাছে । ব্লাউসের বোতাম খুলে স্তনবৃন্ত চেপে ধরে শিশুর মুখে । চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরে অঝোরধারে । বছর দুই আগে প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়াতে এই বাড়িতেই আনন্দের বান ডেকেছিল । বৃহস্পতিবারে হয়েছিল বীথি । এই শাশুড়িই বলেছিল –

"নক্কি এয়েচে গো আমার ঘরে! " যেমন গায়ের রং , তেমন টানা টানা চোখ । দু' মাস বাদেই সুকুমারের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল । এক বড় ব্যবসায়ীর ড্রাইভারি জুটে গেল । মাসের মধ্যে দু'চারদিন অবশ্য একটু দূরে দূরে যেতে হয়, তাহোক পয়সাও তো ভাল । বীথির জন্মের পরে এই শাশুড়িই কত গল্প করত ওর সাথে । প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়া ভাল । এই বাড়িতে তো কোন মেয়ে ছিল না । এই প্রথম মেয়ে । দ্বিতীয় বাচ্চা টা হতে গিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দেয় । মালতির রক্তাল্পতাও ছিল । প্রেশার হাই হয়ে গিয়েছিল । শেষমেশ ডাক্তারবাবু আর কোন রিস্ক না নিয়ে অপারেশন করেন । কালো রোগা বাচ্চা টা বেশ দুর্বল প্রথম থেকেই । একে মেয়ে, তায় কালো , রোগা – শাশুড়ি তো দেখতেও যায়নি হাসপাতালে । আর সুকুমার দাঁতে দাঁত ঘষছিল কবে হাসপাতাল থেকে ছাড়বে , সেই সুযোগের অপেক্ষায় । বাড়িতে আসামাত্রই শুরু হয়ে গেছে গালাগালি, চীৎকার ! যেন এই বাচ্চাটার জন্মের জন্য মালতিই দায়ী । মুখ বুজে সব সহ্য করছিল মালতি । মায়ের কাছে যে গিয়ে থাকবে কদিন, সে অবস্থাও তো নেই । কত কষ্ট করে যে সংসার টানছে মা, সেটা ওর থেকে ভাল আর কে জানে ! ইদানীং সুকুমারের ভাব গতিক ওর ভাল ঠেকছে না । শাশুড়ির সাথে গুজগুজ ফুসফুসও চলছে । ভয় করছে মালতির । সত্যি সত্যি ওরা মেরে ফেলবে না তো ওর মেয়েটা কে!

সেদিনই দুপুরে মালতির সামনে এক বাটি বার্লি ঠেলে দিয়ে শাশুড়ি বলেছিল –

" আমি এট্টু পরেই বেরবো । বিতিরে নে যাচ্ছি । হাটে যেতি হবে আজ । ফিরতি দেরি হবে । দোর টা দিয়ে রেকো । " শাশুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পরেও উঠে দরজা বন্ধ করতে যেতে পারে নি মালতি, শারীরিক দুর্বলতা ই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । কখন যেন তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল । হঠাৎ একটা সমবেত চেঁচামেচি আর ঢোলের আওয়াজে ওর চটকা ভেঙে যায় । অতি কষ্টে দুর্বল শরীর টা কোনমতে টেনে নিয়ে যায় দরজায় । আর ওদের দলটা কে দেখেই মাথাটা গরম হয়ে যায় মালতির । কি করে যে খবর পায় এরা, কে জানে ! ওকে দেখেই ওরা বাচ্চা দেখতে চায় । সংস্কার বশত মেয়েকে কোলে করে নিয়ে আসে মালতি । ওরা মাথায় হাত দিয়ে কি সব বলে , ঢোল বাজায় , শেষে টাকা চায় । মালতি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করে ওর কাছে এক কানাকড়িও নেই । কিন্তু ওরা নাছোড় । মালতি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে এই বাচ্চাটাকে ওর বাড়ির লোক হয়ত মেরেই ফেলবে ! টাকা দেওয়া তো দূরের কথা! ওরা একটা গালাগালি দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সেই সময় একজন ফিরে এসে বাচ্চার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দেয় । সেইই প্রমীলা!

উস্রি দে: লিখতে ভালবাসি, লেখালেখি করি, যদিও খুব বেশি নয়, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় তে প্রকাশিত হয়েছে গল্প, দেশ পত্রিকায় কবিতা ।
আর লিটল ম্যাগাজিন তো আছেই। এছাড়া, কিছু ওয়েব ম্যাগ ।

ঢং

মলয় সরকার

একালে যদিও একান্নবর্তী পরিবার, বিশেষ করে বাঙালী সমাজে, খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের পাড়াতেই আছে । আজও আছে এবং রীতিমত ঝগড়া ঝাঁটি, কুটকচালী, হিংসা এবং সঙ্গে মুখমিষ্টি নিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে।

তিন ভাই - পরেশ, নরেশ আর সুরেশ।বাবা যা রেখে গিয়েছিল সেই একই ভদ্রাসন আগলে গোঁজাগুঁজি করে তিনজনেই একসঙ্গে আছে।

নাঃ, তবে আক্ষরিক অর্থে একান্নবর্তী বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয় - অন্নের হাঁড়ি আলাদা হয়েছে অনেকদিনই , সে ছোট ছেলে সুরেশের বিয়ের পর পরই। এখন ,একই বাড়ীতে তিনখানা ঘরে তিন ভাই নিজের নিজের পরিবার আর ছেলেদের নিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে এ ঘর থেকে ওঘরে, তরকারী -মাছ বা পায়েস মিষ্টি হলে , বাটি চলাচল করে না তা নয়। আবার পান থেকে চুন খসলে, ঠেস দিয়ে কথা , কি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দু-একটা , এ ঘরে ওঘরে ছোঁড়া ছুঁড়ি হয় না এমনও নয়। তবু , এই নিয়েই চলছে, আপদে বিপদে সবাই ,সবার পাশে , ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক, দাঁড়ায়।

বড় পরেশের এক ছেলে নকুল, মেজ নরেশের এক ছেলে বকুল আর ছোট সুরেশের এক মেয়ে মান্তু।তিন ভাই বোনেও নিজের ভাই বোনের মতই বড় হয়েছে।সেখানে খুব যে ভেদাভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নয়।

আরও একটা ব্যাপারে পরেশদের তিন ভাইএর মধ্যে খুব মিল, তা হল, তিন ভাইএরই রোজগারের পথ একই। ওরা তিন ভাইই রিক্সা চালায়। ওদিকে তাদের তিন বৌ আবার এবাড়ী ও বাড়ী কাজ করে।এক কথায়, অভাব অভিযোগ থাকলেও মোটামুটি বিনা ঝঞ্ঝাটে দিন চলে যায়।

নকুল পড়াশোনা করছিল কাছেই একটা সরকারী স্কুলে। উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরে অনেক টালবাহানা করে কলেজে আর ভর্তি হল না। কাজ শিখবে বলে এক লেদ মেশিনের কারখানায় ভর্তি হল।চলছিল ভালই, কাজও মোটামুটি শিখছিল। মালিক এবার কিছু কিছু করে মাসিক হাত খরচাও দিতে শুরু করেছিল।এমন সময় ওখানে আর পোষাচ্ছে না ,বলে , দিল সে কাজ ছেড়ে।মা -বাবা অনেক বুঝিয়েছিল, আর কিছুদিন শেখ, আর একটু পোক্ত হয়ে নে- মালিক যখন এত ভাল।ওদিকে মালিকও তাকে ছেলের মত দেখত । বলেছিল ,আর কিছু হাত খরচা নাহয় বাড়িয়েই দেব, থেকে যাও।তা নকুলের মন কিছুতেই ঘুরল না।

ঘুরল না বললে ভুল বলা হবে, আসলে মনটা ঘুরেই গিয়েছিল, তবে কাজের দিকে নয় ,অন্য দিকে।তার উঠতি বয়সের রঙিন চোখে তখন অন্য রঙ এসে মিশে রামধনু তৈরি করেছে। কাজেই এই কাজে তার মন বসছে না। বাবা না বুঝলেও মা কিছুটা আন্দাজ করেছিল।তবে হাতে হাতে কিছু প্রমাণ ছিল না।নকুল বলল , আমি অন্য জায়গায় কাজ করব বেশি মাইনেতে। বাড়ীর সবাই জানে, নকুল কাজ খুঁজছে, তাই ফিরতে রোজ রাতে দেরী হয়।আজ বলে , এখানে গেছিলাম, কাল বলে ওখানে।

এর মাঝে হঠাৎ একদিন ,বিনামেঘে বজ্রপাতের মত কোন আগের নোটিশ ছাড়াই দুম করে রিক্সা চেপে এনে হাজির করল সিউলীকে।মাজা মাজা রঙ, টিকালো নাকের । ঠিক হরিণ নয়না না হলেও বেশ বড় বড় চোখের অষ্টাদশী শিউলীকে দেখে,সুরেশ তো ছেলেকে “এই মারে তো সেই মারে''।একে তো ছেলে কিছু রোজগারও

করে না, সমস্ত খরচ বাবা মায়ের ঘাড়েই পড়বে।তার উপর এখনও দুজনেরই বিয়ের বয়সের উপযুক্ততা আসে নি।এই অবস্থায় বাবা রাগ করবে, না তো কি, আদর করবে!

মা কিন্তু প্রথমে রাগারাগি করলেও,পরে চুপ করে গেল।সে বুঝে দেখল, ছেলে যখন প্রেম করে বিয়ে করেছে, রাগারাগি করলে বাবা- মাকে ছাড়বে ,তবু বউ ছাড়বে না।তাতে বউটাতো যাবেই আবার ছেলেটাও হাতছাড়া হবে।ওদিকে মেয়েটাকে যদি এখন দয়া দেখানো হয়, পরে অনুগত হয়ে থাকতেও পারে । তাতে সংসারের হাতের কাজের কিছু সুসরও হতে পারে। ক্রমশঃ নিজের বয়সও তো হচ্ছে।শরীরের জোর কমছে- ও যদি কোন রকমে সংসারের কাজটা সামলে দেয় , তাহলে আর এক বাড়ী কাজ ধরলে দুটো পয়সা বাড়তি আসতেও পারে। আবার , বউ এসেছে বলে যদি ছেলের দায়িত্ব বোধ বাড়ে, চাকরী - বাকরী করে যদি সে স্থায়ী কিছু করে, সেটাও আখেরে লাভ।সেদিক থেকে ভাবলে এ বিয়ে মেনে নেওয়াই উচিত।তাড়িয়ে দিলে বা চেঁচামেচি করলে লাভ তো কিছু হবেই না, উপরন্তু লোক হাসাহাসি ছাড়া আর কিছু হবে না।

তাই বড় বৌ, পরেশকে আড়ালে বলে বুঝিয়ে , শান্ত করিয়ে , ছেলে বৌকে বরণ করে ঘরে তুলল। লোককে বলল, কি আর করা যাবে। বয়সটা একটু কম। তা , করে যখন ফেলেইছে ,মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি।লোকেও এক পাত কবজি ডুবিয়ে খেয়ে , বলে গেল, বেশ করেছ নকুলের মা।বৌটিও বেশ । তোমার নকুলের পছন্দ আছে বলতে হবে। এসব আজকালকার দিনে আবার কোন নতুন ঘটনা না কি।সব ঘরেই হচ্ছে।

সবাই মেনে নিলেও মেজ বৌ , অনিতা এ বাড়ী সে বাড়ী বলতে লাগল, বড় বৌ মেনে নিল তাই, আমার ছেলে করলে, ঝ্যাঁটা মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতাম।এমন ছেলে পেটে ধরি নি, আর এমন শিক্ষাও দিই নি। বেকার ছেলে, কোথায় মেলায় না কি আলাপ হল, ব্যস, খোঁজ পরিচয় নেওয়া নেই, বিয়ে করে ফেলল। জানতো, মেয়েটা আবার নাকি নকুলের থেকে বয়সে বড়।মাগো মা--

নকুলের মা শোনে আর চুপ করে থাকে।কিই বা আর বলবে।তার তো বলার মুখ নেই কিছু।

নতুন বৌ কিন্তু বেশ চালাক, চটপটেও বটে। এসেই লজ্জা শরম ছেড়ে ,শাশুড়ির হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করতে শুরু করে দিল।শাশুড়িকে বলল, অনেক কাজ করেছ এতদিন সংসারের। এবার আমাকে করতে দাও আর তুমি একটু বিশ্রাম কর। শ্বশুর শাশুড়ির মুখে মুখে চা টা, জলটা ধরতে লাগল। কাকাশ্বশুর, কাকীশাশুড়ীদের আর দেওর ননদদের মন যুগিয়ে চলতে লাগল।কাজেই অল্পদিনেই সবায়ের মন সহজেই কেড়ে নিল।

শুধু খুশী হয়েও মুখে প্রকাশ করত না মেজ বৌ। মেজবৌ কেবল নকুলের আর তার বৌএর খুঁত খুঁজেই বেড়াত, যদিও সেটা খুব সহজ কাজ ছিল না।তাই বৌএর চাপে যখন নকুল সত্যি সত্যিই একটা ইলেকট্রিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় কাজ পেল , মেজবৌ রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়ে ক'দিন বসে রইল। ফিরে আসতেই নতুন বৌ মুখের গোড়ায় জল চা দিয়ে একটা পাখা এনে বাতাস করতে লাগল।সবে চায়ে মুখ দিয়েছে, এমন সময়, সিউলী হাতের পাখাটা মাটিতে রেখে ঠক করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলতে আরম্ভ করল, জানতো মেজকাকী আমিও একটা কাজ পেয়েছি।ঘরে বসে সেলাই করব।কোম্পানি সেলাইমেসিন, সুতো সব দেবে।কাপড়ও ওরাই দেবে।আমি শুধু ঘরে বসে সেলাই করে দেব।যত করব তত মজুরী।এতে ঘরের কাজ দেখাও হবে, আবার বাড়তি ঘরে বসে রোজগারও হবে।

ব্যস, আর যায় কোথায়। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল যেন। মেজ বউ ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই বসে গল্প শোনার সময় এখন নেই।ক' দিন ছিলাম না, ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে।

সবাই তো নবাবপুত্তুর হয়েছেন। কুটো নেড়ে কেউ সংসারের দুটি করতে পারবে না। সেই আমাকেই সব করতে হবে। এইসব গজগজ করতে করতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। শেষের দিকের কথায়, বাক্যের সঙ্গে আগুনের হলকার মিশেলটা ভালই লক্ষ্য করার মত। কাকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো ছোঁড়া হল, ঠিক না বোঝা গেলেও, যে বলেছিল সে এটা দেখে এবং শুনে, মুখ টিপে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে দেখে তার শাশুড়ির মুখেও হাল্কা হাসির রেখা।

মেজবৌ লোকের বাড়ী বলতে লাগল, নতুন বৌ এমনিতেই দিনরাত সাজগোজ আর মোবাইল নিয়ে বসে আছে, এখন থেকে আবার কাজ করতে শুরু করলে তো আর দেখতে হবে না। সবাইকে দাসী বাঁদী হয়ে থাকতে হবে ওনার। রোজগেরে বৌমা বলে কথা! তারই হাতে মুখে জোগাতে হবে সবাইকে। দেমাকে আর পা পড়বে না!

পাশের ফ্ল্যাটের রায় সব গিন্নী মজা দেখছিলেন। অনিতা ওনাদের বাড়ী কাজ করে। সব শুনে বলে উঠলেন, অনিতা, তোমাকে তো আর কিছু করতে হচ্ছে না। যা হবে ওর শাশুড়ি বুঝবে। তোমার এতে অসুবিধাই বা কি আর রাগেরই বা কি আছে? অনিতা উত্তর না দিয়ে গুম হয়ে চুপ করে রইল।

বছর দুই গড়িয়ে গেছে এর মধ্যে। মেজভাই নরেশের ছেলে বকুল, পড়াশোনার পাট চুকিয়ে একটা ডেকোরেটরের কাছে কাজ করছে। আর তার মা এখনও মনের হিংসা জনিত রাগের চুল্লীটা মাঝে মাঝে উসকে দিয়ে আগুনটা জ্বালিয়ে রেখেছে।

এর মধ্যে হঠাৎ এক কাণ্ড। যেমন করে নকুল কাউকে না জানিয়ে সিউলী কে এনে হাজির করেছিল, বকুলও একদিন মন্দিরাকে একেবারে মন্দিরে সিঁদুর দিয়ে মায়ের সামনে এনে হাজির করে বলল, এই আমার মা, প্রণাম কর।

হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে থতমত খেয়ে মা, পিছু হেঁটে মুখ ঘুরিয়ে ঘরে গিয়ে দোর দিল। বকুল অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মন্দিরা যদিও জানত, প্রথম ধাক্কাটা স্বাভাবিক হবে না, তবুও সত্যিই যখন ঘটনাটার সম্মুখীন হতে হল, কি করবে বুঝতে না পেরে বকুলের পিছন পিছন গিয়ে অন্য সব গুরুজনদের প্রণাম করে পরিচয় পর্ব সারতে শুরু করল।

সে রাত্তিরটা মেজ বৌ, অনিতা গুম মেরে বসে রইল। খাওয়া দাওয়া করল বটে তবে বেশী কারোর সাথে কথা বলল না। সে বোধ হয় আগামী কর্তব্যাকর্তব্য বা লাভ লোকসানের ভাবনাটা বড় বৌএর মত এক লাইনেই ভেবে দেখছিল। তাই কোন চেঁচামেচি না করে বরং মুখে হাসির প্রলেপ লাগিয়ে পরদিন থেকে অবস্থা সামাল দিতে চেষ্টা করল।

শোনা গেল দুই ভাই, নকুল আর বকুলের মধ্যে নাকি মাঝে কোন একদিন তর্ক হয়েছিল, কি নিয়ে কথা হতে হতে, বড় নকুল বলেছিল, পারবি আমার মত মেয়ে তুলে আনতে?

ছোট বকুলও কম যায় না। সে টেবিল চাপড়ে, বলেছিল, তুমি একাই পার ভেবেছ নাকি? আমিও যে পারি তোমাকে কয়েক দিনের মধ্যে দেখিয়ে দেব। এটা এমন কিছু বড় কাজ নয়। নকুল বলেছিল, করে দেখাস, তার পর কথা বলবি।

এই বিয়ে নাকি তারই ফলশ্রুতি।

কিছুদিন পর বেশ বড় করে বিয়ের আয়োজন, লোকজনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করল মেজ বৌ।সাজিয়ে গুজিয়ে বৌ বরণ করে বকুলের মা হাসি মুখে সবাইকেই বলতে থাকল, তখন অত তাড়াহুড়ো করে সব ব্যবস্থা করতে পারিনি তো তা-ই।তা , ছেলের বিয়ে বলে কথা, সখ সাধ তো সবারই থাকে, কি বল?

বড় তরফ এরকম বড় আয়োজন তো করে নি, তাই টেক্কায় মেজরা একটু এগিয়ে রইল ; এটারই চেষ্টা।

তবে আমন্ত্রিত লোকজনের সামনে বার বার করে মেজ বৌ সবাইকে ধরে ধরে বলতে লাগল, আমার বৌমা অন্য বৌয়েদের মত নয়।বেশ ভাল মেয়ে। ছেলের আমার রুচি আছে বলতে হবে।আমরা নিজেরা খুঁজে আনলেও এমন মেয়ে পেতাম কিনা সন্দেহ।কি ব্যবহার, কি যত্ন আত্তি।কি মুখের মিষ্টি গলা।

ওদিকে জনান্তিকে, বড় বৌ প্রতিবেশীকে বলছিল, আমার ছেলে যখন বিয়ে করে আনল, মেজবৌএর ক-ত বড় বড় কথা তখন।আর, আজ যখন নিজের ছেলেও একই কাজ করল, বক্তিমে দেখনা এখন।পাড়া ফাটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে !

মুখটা একটু বেঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলে উঠল,

“ঢ--ং!!!”

মলয় সরকার, শিক্ষা- স্নাতকোত্তর রসায়ন (খড়্গপুর আই আই টি), কর্মজীবনে ব্যাঙ্ক আধিকারিক, বর্তমান অবস্থা- অবসর প্রাপ্ত । নেশা- স্বদেশে ও বিদেশে ভ্রমণ, উদ্যানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সমাজকল্যাণ মূলক কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ ছাড়া ভালোলাগা- লেখালিখি-বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় (পরবাস, জয়ঢাক, মাসকাবারি, অঞ্জলি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ছুটি, অনুবাদ পত্রিকা ও অন্যান্য বহু পত্রপত্রিকায় কবিতা, রম্য রচনা, অনুবাদ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত)।

মেঘ সরিয়ে

চৈতালি সরকার

" তুই কি এক্সপ্রেস গাড়ির মতো ছুটিস? সামনে পেছনে কাউকে দেখতে পাস না? "
নীপার কড়া ডোজের উত্তরে অভি ততোধিক শাসিয়ে উঠল, " কেন দেখতে পাবো না? সামনে মিস ইউনিভার্স নীপা ব্যানার্জী যাচ্ছেন, তাকে না দেখলে চলে?"
"দ্যাখ অভি, দেখা নিয়ে খোঁটা দিবি না। সবাই পৃথিবীতে সুন্দর হবে তার কোনো মানে নেই। তুই দেখতে কি? "

নীপার কথায় একমুখ হাসি এনে অভির উত্তর, " সোনার আংটি আবার বাঁকা! তোর মতো অচল পয়সা কেউ নেবে না বুঝলি।"
অভির এক দোষ, কথা বলার সময় বোঝে না কেউ কষ্ট পাচ্ছে কিনা। বিশেষ করে নীপার ব্যাপারে, কাটা কাটা ডায়ালগে ওকে আঘাত করে কি যে সুখ পায়!

অভির কথায় চোখ ঠেলে জল এল নীপার। বুকটা কামড়ে উঠল যেন! মাঝপথে ঝগড়া থামিয়ে রগড়ে নিল চোখদুটো। দুজনেই কলেজ যাবে। পায়ে পথের ব্যস্ততা , প্ল্যাটফর্মে এ ওর গায়ে জোর ধাক্কা, তাতেই বিপত্তি।

অভি একটু এগিয়ে গিয়েছিল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে বলল, " আবার চোখে কি হল? দেখি। "
নীপা একঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল, " কিছুনা, আমার যাইহোক তোর তাতে কি? "
অভি কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়। ছোট থেকেই দেখছে নীপাকে। একটু অভিমান হলেই কালো মেঘে ঝাপসা মুখ, তারপর বৃষ্টিপাত অবধারিত।

কাছে এসে জোর করে আঙুল ছুঁয়ে তুলে ধরল মুখখানি। আস্তে আস্তে বলল," এতেই চোখে জল? শশুরবাড়ির কেউ কিছু বললে তো গায়ে ফোসকা পড়বে।"

"তোকে ভাবতে হবে না? তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা।" নীপার ঝাঁঝাল স্বরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে অভি চলতে শুরু করল।

নীপার গায়ের রং বেশ কালো। রোগাটে গড়ন। টানা টানা চোখ। মাথায় একঢাল কোঁকড়া চুল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে যখন হাসে মনে হয় কালো মেঘ হরিণী! সেই স্কুল লাইফ থেকে দুজনে একসাথে পড়ছে। এবার মাস্টার ডিগ্রী লাস্ট ইয়ার। অভির ইচ্ছে এরপর গবেষণা করার। নীপা রেজাল্ট বেরোলে বি. এড করে স্কুলের জন্য পরীক্ষা দেবে। নিজের পায়ে ওকে দাঁড়াতেই হবে। অভি শুধু নয়, মা বাবার মুখেও একটাই কথা, কালো মেয়ের পাত্র পাওয়া মুশকিল। যত কদর সাদা চামড়ার। মাঝে মাঝে নীপার ভীষণ রাগ হয়, সবার চোখ কেন সুন্দরীদের দিকে আটকে থাকে? অভি আজকাল একটু বেশিই বলে সুন্দরের কথা। কথায় কথায় মনে করিয়ে দেয় ওর গায়ের রং। আচ্ছা কেউ কি ইচ্ছে করে অসুন্দর হয়? না কালো হওয়া তার নিজের হাতে? নীপা যত ভাবে এসব একদম ভাববে না। অভি ততো মনে করিয়ে দেয়। ও ইচ্ছে করে নীপাকে আঘাত করে। এতে যে ওর কি সুখ বোঝে না নীপা। কতবার ঠিক করেছে অভির সাথে কথা বলবে না কিন্তু পারেনি। অভিই জোর করে কথা বলতে বাধ্য করেছে। তাইতো নীপার ধ্যানজ্ঞান এখন পড়াশোনা। যেভাবেই হোক চাকরি পেতে হবে। বিয়ে না করেই জীবন কাটিয়ে দেবে।

সেদিন কলেজ থেকে বেরোতে দেরী হয়ে গেল। সংস্কৃত স্যার অনেকক্ষণ ক্লাস নিচ্ছিলেন। এদিকে অভির শেষ ক্লাস ছিল না। তাই একাই বাড়ি ফিরতে হবে নীপাকে। ও অবশ্য বেশ খুশি। প্রতিদিনের মতো অভির

বকবক সহ্য করতে হবে না। স্বাধীনভাবে যেতে পারবে। কলেজের সামনে থেকে অটো ধরে নিল নীপা। স্টেশনে পৌঁছতে পৌনে ছটা বেজে গেল। সাতটার আগে কোনো ট্রেন নেই। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি!

পড়ন্ত বিকেলের শেষ আলোটুকু নিভু নিভু, বাতাসে হিমেল ভাব, প্ল্যাটফর্মে দু- চারজনের শ্লথ পায়ে হাঁটাচলা, একঝাঁক পাখির কোলাহল ...... এই নিবিড় একাকীত্বটুকু নীপার বেশ ভালোলাগছে। এই প্রথম মুক্তির অনাবিল স্রোত বইছে ধমনীতে।

ভালোলাগার আবেশে বুদ হয়ে কেটে গেল অনেকটা সময়। পুরু সরের মতো অন্ধকার চারিদিক ঢেকে ফেলছে। স্টেশন চত্বর বেশ শুনশান। প্ল্যাটফর্মে পথচারীর চলাফেরা কমতি পথে। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে উঠল নীপা। দেখে নিল হাতঘড়ি। ট্রেন আসতে এখনও তেতাল্লিশ মিনিট বাকী। খেয়াল করেনি , ওর ঠিক পাশেই দুজন ছেলে কখন এসে বসেছে। বিশ্রী চাহনিতে ওর দিকে তাকিয়ে। ওরা কি একটু একটু করে নীপার দিকে সরে আসছে? মনের মধ্যে সন্দেহের দাগ পড়ল খানিকটা। ভয় ভয় করছে নীপার। একটু দূরে কয়েকটা চায়ের দোকান খোলা আছে অবশ্য। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। এদিকে কারোর দৃষ্টি নেই। নীপা একবার ভাবল, চায়ের দোকানে গিয়ে বসবে। কিন্তু ওখানেও তেমন জায়গা নেই। ট্রেন আসতে এখনও অনেকক্ষণ। কি করবে তাহলে? ছেলেদুটো নিজেদের মধ্যে অশ্লীল কথা চালাচালি করছে। নীপার দিকে ছুঁড়ে দিল কিছুটা। ভয়ে কাঠ হয়ে রইল নীপা। যদি ছেলেদুটো ওর পিছু নেয়। ওর সঙ্গে ট্রেনে ওঠে বসে। তারপর ফাঁকা রাস্তায় কোনো অভব্য আচরণ করে! কি হবে তখন! অভির ঠিক আজকেই আগে যেতে হল। একটু আগেই অভি নেই বলে খুশি হয়েছিল নীপা। কিন্তু এইসময় মনে হচ্ছে অভি থাকলে ভালো হত। ভাবতে ভাবতে খেয়াল করেনি ছেলেদুটো ওর দুপাশে বসে গেছে। দুদিক থেকে চেপে দিয়েছে ওকে।

নীপা চিৎকার করে বলল," ওদিকে জায়গা থাকতে আমার গায়ের কাছে বসেছ কেন? "

ছেলেদুটো রসিয়ে রসিয়ে বলল," মধু নিতে মৌমাছি এসেছে ।"

ওদের কালো দাঁতের ফাঁকে ঝলসে উঠল হাসি। মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে দেশী মদের গন্ধ। নীপার চিৎকারে কয়েকজন তাকাল শুধু। এ যেন রোজকার ঘটনা! কেউ দাঁড়াল না। কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সবটাই নিত্যকার অভ্যাস।

কি করবে নীপা? অসহায়ভাবে চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলে দুটো বেঞ্চ ছেড়ে ওকে ঘিরে ধরেছে। হয়তো এখুনি থাবা বসাবে! নিজেকে বড্ড অসহায় লাগছে। খবরের কাগজে প্রতিদিন ফুটে ওঠে এরকম ঘটনা। সত্যি সত্যি সেরকম যদি হয়। আঁতকে উঠল নীপা। চারিপাশটা বড্ড শূন্য শূন্য লাগছে। হয়তো এক্ষুনি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে।

ঠিক সেই সময় ঝড়ের গতিতে অভি এসে দাঁড়াল পাশে। হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল নীপার শীতল হাত। তারপর ধমকের সুরে বলল," এতক্ষণ ধরে কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে আছি, তুই কখন বেরিয়ে এসেছিস? "

সম্বিত ফিরে পেল মুহূর্তের মধ্যে। অস্থির বুকের তোলপাড় জুড়িয়ে এল ক্রমশ। নিজেকে স্থিতু করে ভাবতে লাগল, কি সুন্দর অভির ধমক! নীপা এই প্রথম ধমকের ভেতর ভালোলাগা অনুভব করল।

অভি ওর জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে? কেন? শুধু বন্ধু বলে? প্রশ্নে তোলপাড় হচ্ছে ভেতরটা। একটু আগের ভয় কেটে গেছে বুদবুদের মতো। ছেলেদুটো কখন সটকে গেছে খেয়াল করেনি। শুধু মনে হচ্ছে অভি কেন অপেক্ষা করছিল?

প্রশ্নটা কি করবে? ভাবতে ভাবতে অভির দিকে তাকাল নীপা।

"কি ভাবছিস মিস ইউনিভার্স?" অভির কথায় ডুকরে উঠল নীপা। ভয় ভালোলাগা সবটুকু বেরিয়ে এল একসাথে।

"আঘাত করে তুই কি সুখ পাস? আমি সুন্দর নই বলে বারবার বলতে হবে?"

নীপার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জল। চিবুক ছুঁয়ে চুঁইয়ে পড়ল নীচে। আলতো হাতে সেই ফোঁটা মুছে দিয়ে অভি বলল," হাঁদা একটা, সব বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"মানে?"

"আর মানে বুঝতে হবেনা। একঘন্টা এই বোকা মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছি। তবু মানে বোঝাতে হবে।" তারপর কানে কানে ফিসফিস করে বলল," আমার কালো ইউনিভার্স! "

তখনই জমাট বাঁধা মেঘে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল যেন!

চৈতালি সরকার বর্ধমানের অন্তর্গত বিল্বেশ্বর বিনোদীলাল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স। কবিতা, গল্প লেখা নেশা। গল্প, কবিতা বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রামের নাম শিয়ালমারি

সজল কুমার মাইতি

" এই প্রজাপতি, তোরা এইদিকে বোস। ফড়িং, তোরা প্রজাপতিদের ডানদিকে সারিবেঁধে বোস। ফুলেরা তোরা মাঝখানে থাক। কাঠবেড়ালি, তোরা আমার বাঁদিকটায় বোস। মৌমাছি, তোরা কিন্তু ফুলেদের কাছে বসবি না। পাখিরা, একদম ফাঁকি দিবি না। দূরে দূরে থাকবি না। আজ যা পড়াব, কাল সেগুলো সব পড়ে আসবি। আমি কিন্তু কাল সবার পড়া ধরবো। কোন ফাঁকি চলবে না।" ছোট্ট মিলির ক্লাসে এরাই ছাত্রছাত্রী। রোজ নিয়ম করে এদের সঙ্গে পড়ানোর ছলে খেলা করে মিলি। মিলি শিয়ালমারি গ্রামের পাঠশালার মাস্টার স্থিতধীর মশাই এর একমাত্র কন্যা। ছোট্ট মিলির ছাত্রছাত্রী রূপী খেলার সাথী এরা। মিলির এক ডাকে এরা সবাই হাজির হয়। মিলি এদের নয়নের মনি। শিয়ালমারি মিলির কল্যাণে যেন ছবিছ্ড়ার দেশ। এর একদিকে তীর্ণা অন্য দিকে তপস্যা। দুই নদী ঘিরে রেখেছে শিয়ালমারিকে।

শিয়ালমারি একটি ছোট্ট কিন্তু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তীর্ণা তপস্যা দুই নদী মিলে শিয়ালমারিকে অনেকটা দ্বীপের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। দুদিকে দুই নদী আর একদিকে ছোট্ট টিলার পাহাড়। সঙ্গে লতা গুল্মে ভরা অরণ্য। দূর থেকে দেখলে শিয়ালমারিকে কোন দেবশিশুর আঁকা ছবির মতো লাগে। এই গাঁয়ে দারিদ্র্য যেন হার মেনেছে। এখানকার বাসিন্দাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কোন অভাব হয় না। গাছপালায় ভরা সবুজের সমারোহ শিয়ালমারিকে শান্তির নীড়ে পরিণত করেছে। ফুলে ফলে প্রকৃতি এখানে দরাজ হস্ত। প্রতিবেশীদের মধ্যে ভালোবাসার অভাব নেই। একে অপরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উৎসবে সবাই মিলে নতুন পোষাকে আনন্দে মেতে ওঠে। শিয়ালমারি যেন এক সুখী পরিবার। এরা সবাই সুখ দুঃখ শেয়ার করে নিতে জানে। চাষবাস এখানে সবাই মিলে করে। ফসল তোলা তাও সবাই মিলে করে। গ্রামে বড়রা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে। ছোটরা খেলাধুলায় মত্ত। ঋতুর পরিবর্তন এখানে রীতিমতো জানান দেয়। গাছপালা ফলফুল আকাশ বাতাসে সেই পরিবর্তন চোখে পড়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহ এখানে মানুষ ভোলে আম কাঁঠালের আমোদে। বর্ষা তার অশ্রুধারার অকৃপণ বর্ষণে ক্ষেত খামার শস্য শ্যামল করে তোলে। বাকী ঋতুরা ও শিয়ালমারিকে তাদের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে নি। সেই জন্য এই গাঁ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণা শস্য শ্যামলা লোভনীয় এক আস্তানা গাছপালা, পশুপাখি ও শিয়ালমারির বাসিন্দাদের কাছে।

হঠাৎ এই সুখের সংসারে দুঃখের কালো ছায়ার মেঘ ঘনিয়ে আসে। সুখ শান্তির নীড় এই শিয়ালমারি আজ আতঙ্কে ভয়ে জড় হয়ে আছে। এই আতঙ্ক ও ভয়ের কারন বিশু ডাকাত ও তার দলবল। বিশু ডাকাত এ তল্লাটের সন্ত্রাস। তার লোমহর্ষক ডাকাতি ও সন্ত্রাস মানুষের মনে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করেছে। সেই বিশু ডাকাত এই শিয়ালমারিকে তার টার্গেট করেছে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় এই গ্রামের বাসিন্দাদের ঘরে ধন সম্পত্তির অভাব নেই। বর্ধিষ্ণু গ্রাম শিয়ালমারির এই সম্পদের অমোঘ আকর্ষণ বিশু ডাকাতকে এই গ্রামের ওপর হামলা করতে প্রলুব্ধ করেছে।

প্রথমদিকে বেছে বেছে কিছু বাড়িতে বিশু ও তার দল আক্রমণ করা শুরু করল। গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু, তারা ডাকাত দলের সঙ্গে পেরে উঠবে কি করে?

ডাকাতদের সঙ্গী যে আগ্নেয়াস্ত্র। বিশুর দল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অনেক নিরীহ গ্রামবাসীর প্রাণ নেয়। বিশুর দল শুধু মানুষ খুন করে না, ধন সম্পত্তি ও লুট করে নিয়ে যায়। আজ শিয়ালমারির চারিদিকে মানুষের হাহাকার। সুখ শান্তিতে ভরা গাঁ আজ অশান্ত, সন্ত্রস্ত। বিশু ডাকাতের ভয়ে আতঙ্কে বহু গ্রামবাসী তাদের প্রাণের প্রিয় গাঁ শিয়ালমারির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে । ফুলে ফলে হাসি খেলায় মেতে থাকা শিয়ালমারিতে আজ শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ছোট্ট মিলির মা বাবাও বিশু ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। ছোট্ট মিলি এখন একা, অনাথ। পাখি, ফড়িং, প্রজাপতিদের আর দেখা মেলে না। তারাও শিয়ালমারিকে ত্যাগ করেছে। বৃক্ষেরা সব পর্ণমোচী হয়ে গেছে। তাতে ফুল ফলের আর দেখা মেলে না। মৌমাছিদের আর গুন গুন স্বরে গান গাইতে শোনা যায় না।

মিলি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর থেকে থেকে ডাক পাড়ে " অ্যাই, প্রজাপতি, পাখি মৌমাছি - তোরা সব কোথায়? তোদের পড়ার সময় যে বয়ে যায়। আর কত ফাঁকি দিবি?" মিলির ডাকে আর কেউ সাড়া দেয় না। কেউ আসে না। বিষণ্ণ মিলির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সে শুধু তার ছাত্রদের খুঁজতে খুঁজতে হেঁটে বেড়ায়। হাঁটতে হাঁটতে একসময় তপস্যা নদীর পাড়ে এসে পৌঁছয়। কুলু কুলু রবে নদী বয়ে চলেছে। ক্লান্ত অবসন্ন মিলি নদীর পাড়ে বসে পড়ে। উদাস নয়নে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেলের সূর্য নদীর জলে মুখ লুকায়। শিয়ালমারিতে অন্ধকার নামে। ছোট্ট মিলি কাঁদতে কাঁদতে নদীর পাড়েই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দই কেবল শিয়ালমারির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে থাকে। আর সব শান্ত, নিস্তব্ধ। হঠাৎ নদীর জলে ঝপাং শব্দে ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সুর কাটে। নদীর পাড়ের আবছা মূর্তিটাকে আর দেখা যায় না। অভাগা শিয়ালমারি কেবল তার নিষ্ঠুর সাক্ষী হয়ে থাকে।

ড. সজল কুমার মাইতি দ্বিশতাব্দী প্রাচীন হুগলী মহসিন কলেজের বানিজ্য বিষয়ের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। চৌত্রিশ বছরের অধিককাল পি জি ও ইউ জি পাঠদানের অভিজ্ঞতা। এর আগে দার্জিলিং সরকারি কলেজ ও গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স এ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলকাতায় বহু বছর পাঠদানের অভিজ্ঞতা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কলেজের বানিজ্য বিষয়ে সিনিয়র সার্ভিসে একমাত্র অধ্যাপক। বিষয়ের লেখা ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজসেবা কাজেও যুক্ত।

অমৃত

হীরক সেনগুপ্ত

১

কুয়ো-পাড়ে বাসনের খলবল শব্দ। বাসন্তীদেবী বারান্দায় এলেন।
এত বাসন! রেখে দে। কুন্তী মাজবে', সুধা হেসে বলল,'এক্ষুনি হয়ে যাবে মা'
২

কাল বড়জা'র রান্নার দিন ছিল।সেজন্যই বাসনে রাগ ফুটছিল, ঝনঝন। বড়জা'র রান্নার নামেই মুখভার।আগুনে তাপে রং কালোর ভয়।মাঝেমধ্যে মেজ'কে ম্যানেজ করে।সেও ফন্দিবাজ,এড়িয়ে যায়। শর্ত করে। যদিও বা রান্নাঘরে এল,হাতে চিরুনি ।খোলা চুল আঁচড়াচ্ছে। শাশুড়ি টিকির-টিকির শুনলেই বড়'জার বিরক্তি।বলে, ধেত্তেরি,ফাটা রেকর্ড চালু।তুই যা'।
তবে কাল মেজ বাড়িই ছিলনা। ছোট পরপর চারদিন হেঁসেল সামলেছে।
দুইবৌ'ই ফুলটুসি।দু'রকমের।আগে হলে সুধাকেই বলত ।তাতেও ফ্যাসাদ।ছোট'র সব কথাতেই 'হ্যাঁ'। এতেও জা'য়েদের রাগ।
বড়-মেজ এনিয়েও নিজেদের মধ্যে ঠাসাঠাসি । তবুও দুইজা' সুধাকে ব্যবহার করে।
'দ্যাখ, ভিজে বেড়াল।সবার কাছে ভালো সাজছে। হাড় শয়তান' মেজ ঠেস দিত,
'তুমিই তো সুযোগ দিচ্ছো ' "সুযোগ মানে? '
'ওকে বলো কেন?তোমার রান্নার দিনে করে নিলেই পারো'
"কেন, তুই সুযোগ নিস না?'
'আমার কম জ্বালা? বাপের বাড়ি, রান্না...দুইই সামলাচ্ছি ।আমি তো রূপসী নই।আঁচে রঙও মরবে না' বড়'জার সুর চড়ে যায়। 'ঠেস দিবি না মেজ।জ্যোতিষী বলেছে,আগুনে ফাঁড়া..তাই'
'সেতো আমারও পাইরোফোবিয়া' 'বড়লোকদের অনেক ফোবিয়া।কে আর দেখতে যাচ্ছে'
'বাপ-মা তুলে কথা বোলো না দিদি।মুখ সামলে...'
কোন্দল সবে গিয়ার চেঞ্জ করছে...বাসন্তীদেবী হাজির।কথাটথা লুকায় মনের হাইড্রেনে।
'কিরে সন্ধ্যাবেলায় কার পিণ্ডি চটকাচ্ছিস?'
'কিছু না মা। টিভি সিরিয়াল...'
'বুঝলাম' শাশুড়ি হেসে ফেলেন,
'জানিস তো বিয়ের পর মেয়েরা কেউ শুঁয়োপোকা, কেউ প্রজাপতি।তোরা কোনটা ?'
শাশুড়ির কৌতুকে বউয়েরা হাত কচলায়।
বড়বৌ কথা ঘোরায়, 'মা,কাল তো শুক্রবার।সন্তোষী মায়ের উদযাপন করবেন বলেছিলেন..'
বাসন্তীদেবীর মুখের হাসিতে গোধূলি লালিত্য ।'বাহ।শাশুড়ির থেকে নিস্তার পেতে উদযাপন!'
মেজবৌয়ের চিরুনি খসে পড়ে।শাশুড়ির মজা লাগে।'দিলি খাটনি বাড়িয়ে। দ্যাখ,কাল আবার কোন অতিথি আসে...'।
৩

এসব সুধাও পাত্তা দেয়না।কুয়ো-তলায় ও ব্যস্ত ছিল কড়াইয়ের তেলে-জলে আকাশের রামধনুতে।চোখ গেছিল থাম্বার মাথায়।
এতদিন যে এটাকে স্রেফ মরা কাঠ লাগত!আজ নতুন পাতা !গত পরশুদিন ঝড়জল হয়েছে। সেদিনও থাম্বাটা কালো ছিল। আজ সবুজের ভুত ! ঘটনাটা আশ্চর্যের।

দিদিকে বলার জন্য মনটা ছটফট করে। দিদি হল ননদ।ভালো নাম কলি।সোদপুরে পড়ায়।
৪

সুধা আঁকে চমৎকার।দুপুরে মনে মনে ফুটে ওঠা একটা ছবি আঁকল। ননদ এলে দৌড়ে আসে।
'দিদি,কেমন হয়েছে?'ছবিটা দেখায়। বিশাল ছড়ানো গাছ,ছাতার মত। চারপাশে রংবেরংয়ের ফুলগাছ।মাঝখানে মোরাম ঢালা ।
'বাহ,বাগানের ছবিটা তো একেবারে রিয়েল-লাইফ! চমৎকার হয়েছে' 'রিয়েল লাইফই তো',
'কিছু দেখে আঁকা?' সুধা মাথা নাড়ে।'না তো।তবে হবে', কলি হাসে,
'হবে মানে?', "কাপড়মেলার গুঁড়িটা আছে ,ওটা ভেবে আঁকা' 'ওরে বাবা।তুই ঐ খটখটে মড়াটাকে জ্যান্ত বানিয়েছিস...', 'না দিদি, ওটা বেঁচে আছে !'
সুধার কথার কলি হাসে। 'কে বেঁচে আছে সুধা?'
কলি-দি তখনও বাইরের কাপড়েই। কলি হাসে। কপালের তোলা চশমা নাকে নেমে এল। শাশুড়ি মায়ের মুখের আদল,ফর্সা।কলি আজ হাল্কা মেরুন খোলের শাড়ি পরেছে।ইঞ্চি-পাড়।থ্রি-কোয়াটার কালো এয়ায়হোস্টোজ ব্লাউজ। হাতা কোঁচকানো। কপালে কালো ভেলভেট বিন্দি।কানে মুক্তোর টপ।বাঁহাতে রুলি। ডানহাতে ঘড়ির স্ট্র্যাপের দাগ। নাকছাবিতে জল চিকচিক করছে।কানের লতিতেও জল।ক্লিপ খোলা ।একগুছি চুল,দোল খাচ্ছে চিবুকে।
'একটা কথা বলব?', 'শুনি' 'ঐ গুঁড়িটা থেকে তারগুলো খুলে দাও। 'মুশকিলে ফেললি।ওখানে অনেকটা জায়গা জামাকাপড় শুকানোর সুবিধা',
সুধা ঘাড় নাড়ে। 'জানি।ওকে বলব।বাঁশ লাগিয়ে দেবে'।
'আচ্ছা বেশ।কাজল না হয় লাগাবে।কিন্তু খাম্বাটা?
সুধার দু'চোখে উত্তেজনার ক্রেসকোগ্রাফ। 'দিদি ওটা আর খাম্বা নেই। উপরে সবুজ পাতা দোল খাচ্ছে' 'কি বলিস!এতবছর দেখছি,শক্ত গুঁড়ি।
ছোটবেলায় পরাণকাকা বসিয়েছিল। বাবাকে বলল, 'দেখো কনক,এক গুঁড়িতেই জীবন কেটে যাবে।যে সে গুঁড়ি নয়।আমকাঠের', 'দেখতে দেখতে কতদিন হল।বাবা চলে গেল।
পরাণকাকাও।গুঁড়িটা তেমনই আছে।আজ আশ্চর্য কথা শোনালি।এতবছর পরে, নতুন পাতা!'
কলি অবাক হয় সুধাকে দেখে।ছোটভাই কাজলের বৌ।ছোটখাটো পুতুল।কোঁকড়ানো চুলের মোটাগোছ, কাঁধ অবধি।ছোট্ট নাক।কাস্তের মত চাপা ঠোঁট। লম্বা আঙ্গুলে পান্নার আংটি।
গাছের পাতায় কথায় আনমনা।মৃত গুঁড়িতে প্রাণ আবিষ্কারে উদ্বেল।সুধারও চোখের মণিতে অতিথি প্রাণের ঘনছায়া।এলোমেলো উড়ছে। চিবুকে হাত রেখে কলি বলল, 'ঠিকাছে।তারপর,কি করবি ?'
সুধা হাসল। 'দেখই না!' সুধা যেন কলির ছোটবোন।কি সরল কথাবার্তা, আহ্লাদীপনা । মনেই হয়না, ভাইয়ের বউ । একথা ভাবতে ভাবতে লকার খোলে কলি। সুধাকে বলে, 'দেখি হাতটা'
কথার চমক শেষ হল না ।সুধাকে কুন্ঠিত করে ওর দুহাতে পরিয়ে দিল সোনার চারগাছি চুড়ি। গলায় চেন। কলির মুখে ঝিকিমিকি আলো। সুধা স্তম্ভিত।নিজেকে অপরাধী লাগে।মাথা ঝুঁকে আছে। বিহ্বল স্বরে বলল, 'কলিদিদি, .. বড়দি ...মেজদিকে?'
কলি, সুধার মুখটা তুলল দেখে। দু'চোখে জল, টলটল করছে।
মাথায় হাত বুলিয়ে স্খলিত কন্ঠে বলল'দূর বোকা...সবাই সব কিছুর উপযুক্ত? যদি বুঝি,ওরাও সংসারে সংপৃক্ত ...আমিই দেব.' দই নারী হৃদয়ের আত্মীয়তার বিষাদ নিঃশব্দে...ছেয়ে যায়। ...বাবা যতদিন ছিল এতটা বোঝা যায়নি। একএকটা সংসার এমন হয়।
ছিল সুবাসিত জয়নগরের মোয়া। হঠাৎ হাত ফসকে ভেঙে যায় ঠাসা গুড়মাখা মিষ্টি গড়ন। তখন ভাঙনেই খইদের শান্তি।...

...মা খুব চাইত।ছেলেরা মিলেমিশে থাকুক। হল না।ভেতরেই যে অর্থের ঘুণ। দুই বৌয়ের পর পর ভাব ।আসলে ওদের কোন দোষ নেই।... ভাইয়েরাই যে ঘর পড়ে যাওয়া সোয়েটারের মত। অন্যমনস্ক বুননের ফাঁক, ক্রমশ বিসদৃশ। ...কমল বড়।কলির পিঠোপিঠি।লটারির ব্যবসা।
ধান্ধাবাজ।মেজভাই কাশী,সরকারি চাকরি ছিল। হতভাগা চাকরিটা ছাড়ল শ্বশুরের কথায় ।...একমাত্র জামাই,ব্যবসার লোভে তালুবন্দি। জুড়ে গেল হার্ডওয়ারের লাইনে।কাঁচাপয়সার ঢালে বেহিসেবি গড়াচ্ছে।শ্বশুরের পয়সায় ফুটানি। বেহায়া।... কলি ভাবনায় বেসামাল,শূন্যতার দহন।
সুধা আবার ডাকল। 'দিদি...' 'হ্যাঁ বল বল 'কলি ম্যানেজ করে।
'জানো,ওর একটা নাম দিয়েছি' 'এর মধ্যে নামও হয়ে গেছে! ''হু।অমৃত'!
'ওরে বাবা,একেবারে অমৃত!সুধার মুখে হাসি,প্রথমার চাঁদ। রাতের গভীরে উজ্জ্বল শুক্লপক্ষ।
৫
পরদিন তার খোলা হল। সুধা ছুটোছুটিতে কাজ করছিল। কুয়োতলাও বাঁধানো হল। কাজ সারতে সন্ধ্যে ।
আজ পূর্ণিমা।সুধা, অমৃত'র গায়ে অন্ধকারে হাত বোলায় ।ক্রূর প্যাঁচ উধাও।তবে শরীরময় বর্ষবলয়ের খসখস, স্থূলতা।আকাশে দু'হাত ছড়িয়ে নিস্তব্ধ চৈতন্যদেব।
ভোরে ঘরাঞ্চি বেয়ে উঠল অমৃতের মাথায়। কমলারোদের নরম বেলফুল ।গর্তের হিজিবিজি নোংরা টপকে ছোট্ট কচিডাল,কুট্টি পাতা। ভয়ে ভয়ে দুলছে।
মনে হল সুধাকে দেখে দোলা থামিয়েছে । শাস্তির জন্য রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায়।এই বুঝি উপড়ে নেবে অমৃতের রেজারেকশন***। সুধার মৃদু স্পর্শে পাতার ধুকপুকানি স্থির।
কোটরের পিঁপড়ের বাসা,পাখির পালক।নীলচে-সাদা ডিম ।তারের বাঁধন কাটা অংশে সাদা দাগ দাগ, ভিজে। গুঁড়ির চারপাশে ভর্তি পানমশলার প্যাকেট। ওষুধের ফয়েল,চুলের দলা।কত অসভ্য ময়লা।
সুধার শোনা কথা, এদিকটায় বাগান ছিল।দূরে বাউন্ডারি ওয়াল। উত্তর-পূর্বে বড়রাস্তা। উত্তরে কুয়ো,তুলসীমঞ্চ । দক্ষিণ-পশ্চিমে সুপুরি,ডাব,নিম,বেল।
দোতলা বাড়ি। উপরনিচ মিলিয়ে ন'টা ঘর।সুধার ঘর দোতলার উত্তরপূর্বে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমৃত'র মাথা দেখা যায়।
৬

মালী কালিপদ খুব কাজের। মাটি খুঁড়ে,পরিচ্ছন্ন হলুদ মাটিতে ফুলের চারা লাগিয়েছে। পরিচর্যায় মেতে উঠল সুধা। নিয়মিত সার-জল।আর সুধার হাতের গুণ।বছর ঘুরতেই ম্যাজিক।অমৃত'র শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে সবুজ পাতায় হাট।আর হারিয়ে যাওয়া বাগানে সারিবদ্ধ ফুলগাছ।চেনা যায় কনক মিত্র'র হাতেগড়া 'বাসন্তীরং'।
৭
প্রথমদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল বাসন্তী।'যাহ! এসব কি।সবার মাঝে হাট হয়ে গেলাম।নামটা পাল্টে দাও', 'হাট আবার কি?' হারাণ বলল, 'কনক,বাড়ির একখানা জব্বর নাম দাও দেখি' 'তা'বলে বউয়ের নাম!"একটু 'রঙে'র তো আড়াল রেখেছি' সেই 'বাসন্তীরং'। দূর থেকে মনেহয় পান্নার ঢেউ,স্থির। কাছে এলে,ছড়ানো সবুজ, ঠিক যেন ধর্মঠাকুরের ছাতা।
অমৃতের ঘনছায়া। নিচে ঘাসের মলমল সর। সারাদিন পাখিদের ব্যস্ততা।প্রজাপতির অহংকারী ডানা।কাঠবিড়ালির কৌতূহলী ফিসফিস।
পিঁপড়েমহলে অতিথির আনাগোনা। মৌমাছিরা কেমন করে যে খবর পায়! ফাজিল শিসে ফুল ঘিরে চক্কর দেয়। বারান্দায় সুধা মগ্ন হয়ে ভাবে.... একবছরেই বাগানের রূপ-সৌন্দর্য ঝলমলে।চৈত্রমাসে আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল।
এসব অন্তরাল আকর্ষণ দেখে দেখে সুধা ভেসে যায়।...বহুদিনের অনাদৃত আমকাঠের গুঁড়ির দুঃস্বপ্ন স্মৃতি,ফুলের আলোয় মিশে গেছে। দিনের অনেকটা সময় সুধা বাগানে থাকে।
অমৃতের ছাইরঙা শরীরে জড়িয়েছে বাকলের আখ্যান।প্রত্যাবর্তনের প্রতিলিপি।

৮

মিত্র-বাড়ির তলায় তলায় গড়ায় কূটকাচালি।বড়বৌ মেজ'র ঘরে গুজগুজ।বাপের বাড়ি থাকলে ফোনে গভীর কথা ।

'বড়দি,সময় থাকতে বড়দাকে বলো।নইলে সব যাবে'

'যাবে মানে?আমাদের ভাগ আছে না। হিসাবের কই,যাবে কই? মেজবৌয়ের ঘরে ফিসফিস ।

'দেখেছো তো, বাগানে কি মন। কাপড়মেলার তার খুলিয়েছে।ওতো আসা থেকেই দেখছি।আমাদের সাহস হলনা।আর ছোট, দু'বছরেই হাত করে ফেলল। মরাকাঠ নিয়ে কি ন্যাকামিই না করতে পারে।

তারপর ঐ মালী,বাগান... মিচকে শয়তান' বড়বৌ টুসির হাত ঘুরিয়ে উত্তর,' ঠাকুরপোকে বল।শিগগির হিল্লে করতে,' বড়জা'য়ের হাত ঘোরানো, পপির চোখ ছুঁয়ে যায়। পলা বাঁধানো,চারগাছা সলিড চুড়ির ঝিনিক ঝিনিক শব্দ।মেজবৌ,পপির ,হাড় জ্বলে।

ভাবল ঈশ!আজই মান্তাসা,চুড়,আর বারোগাছা মায়ের কাছে রেখে এলাম! ... ঝিনিক ঝিনিকে গা কশকশ করে।দুম করে মেজাজ চড়ে গেল। 'তুমি শুধু হিল্লের কথা ভাবছো।ভাগটা ভাবো..'

একথাটা বলতে গিয়েও চুপ করে।পপির মুখে হাসি, ঈর্ষার আঠায় কোনক্রমে জোড়া লাগানো। নকল হাই। ইচ্ছে করে কথা ভাঙ্গে ... 'ও ...যাদের জিনিস ...তারা বুঝবে... বড্ড ঘুম পেয়েছে... ছাড়ো'

টুসি আশ্চর্য হয়।ছেড়েও ছাড়ে না।আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল, 'রাখালি রে রাখালি /কত খেলা দেখালি...'

কথা না বাড়িয়ে টুসি ফটাস করে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।পপি একছুটে দরজা বন্ধ করে।আলমারি খুলে গয়না পরতে বসল।ঘড়িতে তখন দুটো।

টুসি ঘরে এল।মাথায় আগুন জ্বলছে।ন'বছরের মেয়ে, মাকে দেখেই ট্যাঁ করল।ঠাস করে থাপ্পড় দিল।

কমলের সবে ঘুমিয়েছে ।

চিৎকার করে, 'কি হল?এত রাতে মারধর করছো কেন?'

টুসি মুখ ঝামটা দেয়, 'বেশ করেছি।যা বোঝো না,তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।মেজবৌয়ের পা ধোয়া জল খেও'

কমল বদরাগী। 'ধেৎ শালা।লাইফ হেল করে দিল' চাদর নিয়ে অন্য ঘরে গেল।

৯

সুধাকে দুই'জা এড়িয়ে চলে। বাসন্তীদেবী সবই বোঝেন।নিরুপায় চুপচাপ।হাত থেকে হাল পিছলে গেছে।কলি প্রতিবাদ করে।তবে ধূর্ত গৃহযুদ্ধ করতে রুচিতে বাধে।

কাজল কম কথার মানুষ। সব টের পায়। সংসারের টেকটনিক প্লেটের বিচ্যুতি,সুনামি এল বলে। ঝুটঝামেলায় হাঁপিয়ে ওঠে।

বোঝে, সুধার শিল্পীমন জুড়ে আছে অমৃত। তবে অহেতুক ইমোশনাল হ্যাজার্ডসও জোরালো হচ্ছে।

ছিল একখণ্ড ঘাসজমি, নিষ্প্রদীপ কাঠের গুঁড়ি। বদলে গেছে উচ্ছল বাগান আর প্রাণবন্ত বৃক্ষে, তাতেই অপরাধ! প্রাণের পুনরুজ্জীবনে কি বিষ আছে!অমৃত মন্থনে এত ঈর্ষা ?

১০

সকাল থেকেই সুধার মুখ ভার।জমিবাড়ি ভাগাভাগি শুনে অস্থির।'কলিদি,জমিটা কি বিক্রি না করলেই নয়? দাদাদের তো অবস্থা এমন নয়, সংসার চলছে না। বিক্রিতে কতই বা টাকা হবে।টাকাই কি সব?' সুধা আঁচলে চোখ মোছে।

কলি বলল, 'বলতে লজ্জা লাগে ,এরা আমারই ভাই। ভাগাড়ের শকুনের মত ছিন্নভিন্ন সংসারের কাঁচা টাকার গন্ধে হাঁ করে আছে। পাচকাঠা জমি বাবা কিনেছিল একশো টাকায়।

এখন বিধান কলোনিকে চেনা যায়? চড়চড় করে জমির দাম উঠছে। অনেকেই জমিজমা বেচেছে।

কাঁচাপয়সা উড়ছে', তুই অমৃতকে এনে ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিস',

কথাটায় সুধা অত্যন্ত বিস্মিত হল। 'ভয়! কিসের ভয়?'

'কেন টের পাসনা। দুই বউয়ের রাতদিন চোখ ঘুরছে? শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়?
“কেন?' 'ওরা ভেবেছে,তুই ঐ অমৃতের অছিলায় সব জমিটুকু কেড়ে নিবি'
'মানে!' 'অমৃত...তো আগেই ছিল।আমি তো কিছু করিনি...এই,ফুল পাতা, ছায়া..সব তো ওর ..এত পাখি কীটপতঙ্গ, হইচই ...এসেছে অমৃত'র টানে।আমি কে.!.'সুধার গলা আদ্র।দুচোখ অলকানন্দা, শীতল গভীরতায় মাত্রাহীন।
অমৃত যেন আত্মঘাতী পুনরুত্থানের বেদনা ...সুধা নীরব নির্জনতায় ভেসে যায়।এ পৃথিবীর কোথাও কি অমৃত'র এতটুকু স্থান নেই!যে হারিয়ে গেল,সে কি মন থেকেও মুছে যায়!তার হঠাৎ ফিরে আসা, শুধুই বিড়ম্বনা?সুধার পিঠে কলির হাত ।'লোভের করাত, হিংসার বিষদানা,.. দেখা যায়না রে সুধা। উপড়ে ফেলারও যো নেইা
১১
কাজলের বদলির অর্ডারে কমল আর কাশীর তৎপরতা বেড়েছে।সম্পত্তির হেস্তনেস্ত চাই।
রাতেই কাজলকে ডাকে । আড়ালে দুই বৌ।
কমল বলে, 'দ্যাখ, কাজল,তোর রেলের চাকরি।মোটা মাইনে,পেনশন।আমাদের আয় অনিশ্চিত',
কাজল বলল, 'ভণিতা কোরো না ।সোজাসুজি বলো'
কাশী বলল, 'মা চাইছে। যাবার আগে জমিবাড়ি আমাদের ভাগ করে দিতে',
কাজল অবাক হয়, ‘মা চাইছে! আমাকে কিছু জানায়নি। দিদিরও তো ভাগ আছে। দিদিকে ডাকো'
কলি ঘরে ছিল।বড়বৌ এল,'দিদি...' 'শুনলাম',
১২
পপি বরকে ধরিয়ে দিল কথাটা।যা টুসিকে বলতে গিয়েও বলেনি।
কাশী শুরু করল, 'দ্যাখ।যা হবে ,সমান সমান।চারভাগ'
'চারভাগ মানে? মা'কে বাদ?'
‘...না ইয়ে...' কমল পোঁ ধরে। 'ঠিক বাদ নয়।তবে মা'রও তো বয়স..'
'হোক।তোর কি?মা এখনও বেঁচে'
'ঠিকাছে। সমান পাঁচভাগ'
কাশী ফ্যাকড়া তুলল, এটা ঠিক হল? তোর হিস্যা কি বেশি হচ্ছে না?'
কাজল বুঝল না। 'বেশি কেন?'
'আমরা অত বোকা নই।সমান পাঁচভাগ হলেও,দিদি আর মায়ের ভাগ পাবে সুধা। ঐসব বাগান, গাছ যে বাহানা, তা কি আমরা বুঝি না।তোর সেয়ানা বউ।ঠিক জায়গায় তেল দিয়েছে...'
কথাটা শুনেই কলির গা গুলিয়ে ওঠে।
১৩
সুধা নিজের ঘরে ছটফট করে। ছুটে অমৃত'র কাছে আসে।অমৃত বুঝি অপেক্ষায় ছিল। জ্যোৎস্নায় সবুজ পাতার কুইলিং,থরথর। ভরা প্রশাখা দুলছে।সুধার চোখের পাশে নেমে আসে। আঙ্গুলের স্পর্শে অমৃতের বিষণ্ণ বাষ্পমোচন। সুধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্যোপায়। নির্দোষ নিভৃত প্রকৃতি প্রেমে মগ্ন, এক মস্ত অপরাধী।
১৪
বাসন্তীদেবী কল্পনাও করেননি।এ হুমকি,অপমান, তারই গর্ভজাত! জালনা দিয়ে অমৃতের ছায়া দেখেন । আমের বোলে হাওয়ার নিশ্চিন্ত ঝুমঝুমি। বিড়বিড় করে,.... 'কনক,তোমার 'বাসন্তীরং' ফিরিয়ে নাও।ক্ষমা করো। 'বাসন্তীরং'য়ের ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবে তোমার ভালোবাসা..' দুচোখে ভরা বাসন্তী মিত্র'র তরল কনকবিন্দু। দেওয়ালে কনকের হাসছে।সে হাসির আলোয় কনক বালিশে মাথা রাখে, ভুরু নাচায়,
'রাণী,মনখারাপ ?' 'জানো না?'...
অনেকক্ষণ প্রোমোটার এসেছে।কাশী আর কমল ঝড়ের গতিতে আসে। কলিও ঢুকল।কাশীর অত্যন্ত কর্কশ অবজ্ঞা ছিটকে আসে।
'এই বুড়ি,দলিল কোথায় '

কলি বলল, 'এখন হবেনা।মা'র শরীর খারাপ'
'চুপ কর, সবসময় সর্দারি।আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলছি ,কেন নাক গলাচ্ছিস?'
'বেশ করেছি..'
বাসন্তীদেবী হাত তুলে কলিকে থামায় । ক্ষীণকন্ঠে বলে, 'ব্যাঙ্কে ।কলি নি'আসবে'
কমল অস্থির। ঠেস দেয়, 'ওহ!তুমি তো অবিশ্বাসী ।সব দিদির জিম্মায়। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?'
'না, আসোনি। তবে ভাসিয়েই দেওয়া উচিত ছিল' বাসন্তীদেবীর হাঁপ ধরে যায়,
'দালালকে অন্যদিন আসতে বলো'
'ওরা কি তোমার চাকর?
'তা কেন? তোমরা ওদের গোলাম।এখন যাও'।
১৫
জমির দলিল বীক্ষণকাকুর হাতে। কনকের উকিল-বন্ধু। সুধা-কাজল এল না।
বীক্ষণ কানুনগো বললেন, 'বাকিরা?'
অলি চুপ।
কমল বলল,'ওরা সেয়ানা,ফ্যাকড়াবাজ।ওদের ছাড়ুন'
কাশী,বাইরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করায়। 'কাকু,ইনি সূরজমল, ডেভেলপার'
বীক্ষণের পাকা চুল, মোটা গোঁফ।নাকের দু'পাশে ভাঁজ। চশমার উপরের দেখে বলল।
'কনকের সাধের বাড়ি....'
দলিলটা পড়তে থাকেন মনে মনে। পড়া শেষে সংক্ষেপ বললেন,
'জমিবাড়ি...দেবত্র সম্পত্তি।দেবীবাসন্তীর নামে ট্রাস্ট, উৎসর্গিত।
বিক্রি, হস্তান্তর নিষেধ'!!!

হীরক সেনগুপ্ত, সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা।কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা শিক্ষকতা।
অবসর বিনোদন :ফটোগ্রাফি, ভ্রমণ, ডুডলস ,বইপড়া ,হাতের লেখা ।

সোনালী রিদিম

ড. সাধন কুমার পাত্র

গিরিময়ূর কদম গাছকে আঁকড়ে ধরে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে চায়, আজীবন। সোনালীর আজ ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দিন।কেমন যেন একা একা।পরিচয় হলো অমিতার সঙ্গে।অমিতারা অনার্স এখানেই পড়েছে।ওদের কাছে পরিবেশ বেশ স্বাভাবিক। অমিতা ওকে সঙ্গে করে স্টুডেন্ট ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। মস্ত বড় হলঘর।হৈ হুল্লোড়ে মেতে আছে সবাই।একটি টেবিলকে ঘিরে কয়েকজন মিলে উচ্চস্বরে গান ধরেছে। ঐ যে গানটি –'তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই'।গানটি এখন বেশ হিট করেছে।দুদিন আগে, লোকাল ট্রেনে আসার পথে একদল ছেলেমেয়ে এই গানটি দিয়েই জমিয়ে রেখেছিল।গান সোনালীর ভীষণ প্রিয়।দল বেঁধে বসে পড়লো টেবিলের সামনে।মনে মনে সুর মেলাচ্ছে সোনালী। প্রথমদিন। কিছুটা অপ্রস্তুত সেকারণে।সবকিছুই নতুন। তাছাড়া সবার সাথে পরিচয়ও হয়ে ওঠেনি।রিদিম বেশ উচ্চস্বরে গাইছে।হাত নাড়ার ভঙ্গীটিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। সারা ক্যান্টিন জুড়ে সিগারেটের ধোঁওয়া সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে এগিয়ে চলেছে নিজস্ব ভঙ্গিমায়।মনে মনে খুব এনজয় করছে সোনালী।এইভাবে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কখন যে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে,বুঝতে পারেনি।অমিতা সোনালীর সাথে সকলের পরিচয় করাতে চাইলো।তড়িঘড়ি অনেকগুলো হাত এগিয়ে এলো সোনালীর দিকে।রিদিমের আবার সবকিছুতেই একটু বেশি বেশি।সে সোনালীর হাত ধরেই চোখ বন্ধ করলো। দুটি হাত মিনিট দুয়েকের মধ্যেই যেন পরস্পরকে অনেক কথা বলতে চাইলো।সোনালীর চোখ লজ্জায় অবনত হয়ে রইলো, অনেকক্ষণ।

দ্বিতীয়দিন। ক্লাসে এলেন পি. জি. স্যার।সোনালী আর রিদিম আজ প্রায় মুখোমুখি বসে।ফাজিল রিদিম একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।সোনালী বার বার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলেও গতকালের ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।পি. জি. স্যার নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলেন।আমি পি. জি. স্যার।পি. জি. মানে কিন্তু পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট নয়।পঞ্চানন ঘটক।ছাত্রছাত্রীদের সাথে কমবেশি পরিচয়ের পর স্যার বলে উঠলেন–আচ্ছা বলতো, মানুষ ঘাস খায়? সকলে এ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। পাক্কা রিদিম দাঁড়িয়ে বললো–না স্যার, গরু ঘাস খায়। স্যার বললেন–ওহে, মানুষও ঘাস খায়।কিন্তু প্রশ্ন হলো, কখন খায়? দেখবে যখন কোন পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকা একান্তে নিরিবিলিতে বসে আবেগমথিত হয়ে ওঠে, তখন প্রথমে বাদাম, পরে বাদামের খোসা এবং শেষে অজান্তেই ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। সুতরাং মানুষ ঘাস খায়।কিন্তু স্যারের বক্তব্য তো এতো সাধারণ নয়। এই কথার মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে তিনি বোধ হয় প্রথমেই বোঝাতে চাইলেন যে, মানুষ ঘাস খাওয়া শুরু করলে গরু হয়ে যায়। স্যারের এতো কথার মধ্যেও কোন এক অজানা কারণে সোনালীর দৃষ্টি বার বার রিদিমের চোখেই আবদ্ধ থাকতে চাইলো।

ক্লাস শেষে, আজ আর ক্যান্টিনে নয়। মাঠে। সাত সবুজ উজ্জ্বল যৌবন একসাথে।অমিতা, তপতী, সোনালী, রিদিম, আদিত্য, সাধন, সুজিত।রিদিমের গিটার সবসময়ের মতো পিঠেই ঝুলে আছে।সবুজ ঘাসের উপরে গোল করে বসে রয়েছে সবাই।রিদিম মনে মনে উপরের নীল আকাশের সাথে সোনালীর মিল খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে।আর ঠিক তখনই এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো মাথার উপর।দিন ও রাত্রির মতো ওরা প্রতিদিনই কোথায় যেন চলে যায়।আড্ডা জমে উঠলো গানে আর কবিতায়।আজ প্রথম সোনালী গান ধরলো–'ভালো করিয়া বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে'।গলায় সে কি সুর।স্বয়ং সরস্বতী যেন কণ্ঠে বসে রয়েছেন। গিটারে সুর তুলতে তুলতে রিদিম কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে বুঝতেই পারেনি। এরকমই হয়। সুর, গান কখন যে কাকে আপন করে নেয়, বোঝা যায় না।

সোনালী হোস্টেলে থাকে।ওর অরিজিনাল বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা।পড়াশোনার জন্যই কোলকাতায় আসা। বাবা মস্ত বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। মা সঙ্গীতশিল্পী। বাংলাদেশে বিরাট নামডাক আছে।মায়ের কিছু অংশ তার একমাত্র মেয়ে পেয়েছে। হোস্টেলে রুমের মধ্যে সোনালী তখন একা। কোমল হাতের উপর মুখ রেখে একমনে ভেবে চলেছে।ওর ভাবনার একমাত্র আশ্রয় এখন রিদিম। কিন্তু কেন? যার সম্বন্ধে ও কিছুই জানেনা।

এই তো দুদিন আগেই প্রথম আলাপ হয়েছে দুজনের। ওর গানের গলা ও সাবলীল কথাবার্তা সত্যিই অসাধারণ। প্রথমদিনের ঐ হাতের স্পর্শ বেশ নিবিড়। সোনালী জীবনে এই প্রথম কারও স্পর্শে সুখ খুঁজে পেয়েছে।রিদিম তো আহামরি কিছু নয়। অতি সাধারণ।চেহারায় আকর্ষণের মতো তেমন কিছু নেই।তবে চোখ দুটি ভারি সুন্দর। ঐ বিনয়ী চোখ দুটিতেই যেন ভালো লাগার সমস্ত ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়ে আছে। আচ্ছা রিদিমেরও কি আমার প্রতি।এইরূপ অসংখ্য প্রশ্ন সারা রাত্রি জুড়ে বিছানার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে। উত্তর খুঁজতে খুঁজতে কখন যে রাত্রি গড়িয়ে ভোরের পাখি জেগে উঠেছে সোনালী বুঝতেই পারেনি।

আর কদিন পরেই নবীনবরণের অনুষ্ঠান। কানাঘুষোয় অধ্যাপকমহলেও পৌঁছে গেছে সোনালীর গানের কথা। সেদিন তো এক তরুণ প্রফেসর এক ক্লাস ছেলেমেয়ের মধ্যেই তা ব্যক্ত করে বসলেন। আবার অনুষ্ঠানে সোনালীকে গান গাইতে হবে, একথাও বলে রাখলেন। হৈ হৈ রব উঠলো ক্লাসে। সোনালী বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মিতভাষিণী মেয়ের মুখ থেকে এই প্রথম কথা শুনতে পেল সবাই।কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠলো- ‘আমি জানিনা, কে বা কারা এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলেছে।তবে বিশ্বাস করুন স্যার, গান আমি জানি। ছোটবেলা থেকে মা আমাকে ধরে ধরে গান শিখিয়েছেন। আমি গান গাইবো। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানেন যে এখানে আর একজন আছে, যে আমার চেয়েও ভালো গান করে’। সকলের দৃষ্টি এক হয়ে তখন রিদিমের দিকে। রিদিম উঠে দাঁড়ালো।কিছু বলার আগেই স্যার বলে বসলেন-রিদিম আমাদের গর্ব। আজ তিন বছর ধরে ওর গান শুনে আসছি।ওর কোন তুলনা হয়না।

বরণ অনুষ্ঠান চলছে।এক এক করে চন্দনের ফোঁটা আর গোলাপের স্টিক দিয়ে প্রবীণেরা বরণ করছে নবীনদের।সোনালী দর্শ-কাসনে দেওয়াল ঘেঁসে বসে আছে।শাড়ীর সাজে আজ সে যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা। মুখের লাল আর চোখে কাজলের টান যেন স্বয়ং বিধাতার হাতে লেপে দেওয়া।সকলের চোখ একবার করে এসে সোনালীর চোখেই মিলিয়ে যাচ্ছে নিমেষে।আজ রিদিম একটু অন্যরকম।মনের ঔজ্জ্বল্য যেন হারিয়ে গেছে। স্বাভাবিকতাও শরীরছাড়া।তবে কি সোনালীকে সে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছে।কিন্তু সেটাও তো কথা নয়। এমন সময় ডাক পড়লো রিদিমের।ধীর গতিতে মঞ্চে এলো রিদিম। করতালির স্বতস্ফুর্ততাই তাকে বরণ করলো অন্যান্য দিনের মতো।রিদিম শুরু করলো-‘এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়, একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু’। এই গান সোনালীকে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো।রিদিমের এই সুরে সে যেন ভরা নদীর জলে ভেসে অল্প অল্প করে এগিয়ে চলেছে সাগরের দিকে।তার চোখমুখ থেকে সারা শরীর স্বপ্নের আবেশে ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ। এমন সময় সম্বিৎ ফিরে পেল। গান শেষে করতালির গভীর উচ্ছ্বাসে। এরপর একটি আবৃত্তি।তারপর সোনালী। কিন্তু না।আচমকা ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো সোনালীর নাম। এই প্রথম। সোনালী গান গাইবে। বিভাগের সকলে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় আছে। মঞ্চ থেকে সোনালী প্রথমেই খুঁজে নিলো তার প্রিয় মানুষটিকে। চোখে চোখ রেখে শুরু করলো- ‘হরি হরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ’।আ-হা-হা। সে কি সুর। সেই সুরের আহ্বানে সমস্ত দেবতারাও যেন মর্ত্যে নেমে আসতে চাইছেন অদৃশ্য হয়ে। রিদিম স্থির হয়ে সেই সুরকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।একমনে পড়ে নিতে চাইছে তাকে, তার অনাবিল সৌন্দর্যকে।গানের শেষে মঞ্চ থেকে নেমে এলো।অসংখ্য প্রশংসাবাণী উড়ে আসতে লাগলো তাকে ঘিরে। তরুণ প্রফেসর পাশের চেয়ারে বসিয়ে নিলেন তাকে। রিদিম দূর থেকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো দুজনের দিকে। অনুষ্ঠান শেষে সকলেই একে একে অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়লো। রিদিমেই কেবল একা থেকে গেলো কক্ষের ভিতরে।কিছুক্ষণের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে

এলো সোনালী। মেহেন্দির নকশা আঁকা হাত বাড়িয়ে দিলো রিদিমের দিকে অবিকল প্রথম দিনের মতো। রিদিম হাতে হাত রাখলো ঠিকই, কিন্তু প্রথমদিনের সেই উন্মাদনা আজ আর নেই। দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো বড় রাস্তায়। আগামীকাল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে নাটক দেখার অভিলাষ জানিয়ে দিলো রিদিমকে।

রিদিম মেসে থাকে। বাবা ও মা দুজনেই স্কুল টিচার। বাড়ি বাঁকুড়া শহরে। আজ তার মানসরাজ্যে, শুধুই সোনালী। রিদিম আজ নিজের চোখে দেখেছে, কেমন করে কতো কাছের বন্ধুবান্ধবীও ছেড়ে চলে যায়। এতোদিনের রিদিম যেন আজকের সোনালী। যার কন্ঠ এখন সমস্ত জগতকে আপন করে নিয়েছে। এমনকি রিদিমকেও। ওর গানে, কথাবার্তায় ও ব্যবহারে রিদিম মুগ্ধ। মনের অজান্তেই দুর্বলতা কখন যে বাসা বেঁধে বসে আছে, তার টেরও পায়নি সে। কয়েকদিনের আলাপ। তারই মধ্যে সেই যেন জীবনের সব হয়ে উঠেছে। ভাবনার গভীর বিষয় হয়ে তোলপাড় করছে মনকে। সোনালীর ব্যক্তিপরিচয় এখনো স্পষ্ট নয় রিদিমের কাছে। তথাপি বিভিন্ন ভাবনা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক এসেই যাচ্ছে মনে। এইরূপ ভাবতে ভাবতেই সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লো রিদিম।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের পাশে। নন্দন চত্বরে। অসংখ্য যুগলের মাঝে সোনালী ও রিদিম। হালকা শীতে কফির কাপ হাতে ধরে পরস্পর যেন পরস্পরকে বুঝে নিতে চাইছে। উভয়ের অনেক কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও কথাগুলি কন্ঠনালীতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, বারেবারে। মুখের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব শুষ্ক হয়ে উঠছে যখন–তখন। দুজোড়া চোখ অনেকক্ষণ ধরে নীরবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে চলেছে। সেই প্রাণচঞ্চল রিদিম আজও নিষ্প্রভ। প্রথমদিনের সেই উদ্দামতা আর কোনদিন চোখে পড়ে না সোনালীর। অথচ প্রথমদিনের সেই স্মার্টনেসটাই আজ প্রেম হয়ে উঠেছে তার জীবনে। রিদিম একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁওয়া এসে লাগলো দুজনের চোখেমুখে। সিগারেট নাপছন্দ সোনালীর। কিন্তু না। আজ আর সে কিছু বললো না। নাটকের সময় হয়ে এলো। তারা এগিয়ে চললো ফাইন আর্টসের দিকে। নাটক শুরু হলে, দর্শকাসন অন্ধকারে ভরে উঠলো। ঘন অন্ধকারে পাশাপাশি দুজন। নিশ্বাসের শব্দে নির্ধারণ হচ্ছে পরস্পরের দূরত্ব। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোনালী রিদিমের শান্ত হাত টেনে নিয়ে ধরে বসলো। আর ঐ হাতের মধ্যেই খুঁজতে থাকলো তার ভালোবাসাকে।

এইভাবে প্রায় প্রতিদিন। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, উদ্যানবাটী, কলেজস্ট্রিট প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে থাকলো ওরা। পার্ট ওয়ানে দুজনেই ফার্স্ট ক্লাস পেলো। দেখতে দেখতে পার্ট টুও কমপ্লিট হয়ে গেলো। কথায় বলে, সুখের সময় বড় তাড়াতাড়ি চলে যায়। সোনালীকে দেশে ফিরতে হবে। বাবার শরীর ভালো নেই। একথা শোনার পর থেকে মন ভালো নেই রিদিমেরও। ইচ্ছা না থাকলেও সোনালীর কিছু করার নেই। বিকেলে ট্যাক্সি নিয়ে শ্যামবাজারের উপর দিয়ে সোনালী যাবে। রিদিমকে ওখানেই দাঁড়াতে বলেছে। মুখ ভার করে রিদিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ট্যাক্সি দেখে চলেছে। শেষমেশ একটা ট্যাক্সি ইউ টার্ন নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। নেমে এলো সোনালী। এই সোনালীকে রিদিম আগে কখনো দেখেনি। সে যেন তার না দেখা এক নতুন মেমসাহেব। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত স্যু। একটা সর্ট গোলাপি স্কার্ট। মাথায় মেমটুপি। ব্ল্যাক কালারের চওড়া সানগ্লাস খুলতেই রিদিম দেখলো– চোখ থেকে কাজল নেমে আসছে ক্রমশ গলার দিকে। ভরা পুকুরের মতো চোখ দুটি যেন অবিরাম কানাশ খুঁজে চলেছে। রিদিমের হাত দুটো বুকের কাছে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে রইলো। হাতে আর বেশি সময় নেই। ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো সোনালী। হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চললো স্টেশনের দিকে। বাকরুদ্ধ রিদিম নীল আকাশের বুকে কালো মেঘ দেখতে থাকলো।

পরে অনেক বছর ধরে সোনালীকে খুঁজে চলেছে। কিন্তু আর কখনো দেখা হয়নি। একবার ফেসবুকে সে সোনালীকে দেখেছিলো। তার দুই ছেলের সাথে। মেসেঞ্জারে মেসেজ করে বলেছিলো–' সোনালী! আমি রিদিম। সোনালী, আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার রিদিম'। দেখেছিলো, প্রশ্নগুলিও পড়েছিলো। কিন্তু উত্তর আর কোনদিন আসেনি।

–

ড. সাধন কুমার পাত্র। জন্ম বাঁকুড়া জেলার কাদড়া গ্রামে। পেশায় অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ., এম. ফিল., ও পিএইচ. ডি.। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা তার শখ। প্রকাশিত গ্রন্থ – ফুলমনি (উপন্যাস), কারক-প্রকরণ, কাব্যভেদবিমর্ষঃ ও সহজ অনুবাদ-শিক্ষক। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন।

অন্য কেরালা

তাপস সরকার

বেশ কয়েক বছর আগে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক সম্বন্ধে একটা মনোজ্ঞ লেখা পড়েছিলাম ।কলকাতার একদল অভিযাত্রী বিশেষ অনুমতি নিয়ে সাইলেন্ট ভ্যালির মধ্যে দিয়ে থ্রু (through) ট্রেক করেছিল। গোটা পৃথিবীতে সত্যিকারের যে কটা হাতেগোনা রেনফরেস্ট আছে সাইলেন্ট ভ্যালি তার মধ্যে অন্যতম । আর আছে ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকায়, আফ্রিকার জাইর এ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়াতে । সারাবছরই অসূর্যম্পশ্যা এবং মেঘ-বৃষ্টির সমারোহ । সাইলেন্ট ভ্যালি হলো 50 লাখ বছরের জঙ্গলের এক জীবন্ত গবেষণাগার । এরকম একটা মহাতীর্থ দর্শনের একটা সুপ্তবাসনা তখনই তৈরি হয়েছিল । পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল সাধারণ পর্যটকদের জন্য খুব সামান্য অংশই উন্মুক্ত। তাই ই সই । এতে তীর্থ দর্শনের পুণ্য কিছু কম হবে না ।

2017 সালে দুর্গাপূজা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। শনি রবি, দশেরার ছুটি, গান্ধী জয়ন্তী এবং সঙ্গে দু'একদিন ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বেশ একটা লম্বা অবকাশ পাওয়া গেল । টিকিট কাটা হল মুম্বাই কোচি এবং কোয়েম্বাটুর মুম্বাই ।যাওয়া আসা নিয়ে 10 দিনের সফর।

ঈশ্বরের আপন দেশ কেরালা সবারই ভ্রমণ তালিকায় একেবারে উপরের দিকে থাকে । পাহাড়, জঙ্গল, ব্যাক ওয়াটার, বিস্তৃত বেলাভূমি এই সব নিয়ে কেরালা অনন্য সুন্দর । কেরালা ভ্রমণ বলতে যে বিখ্যাত নাম গুলো মনে আসে যেমন তিরুবনন্তপুরম, কোভালাম, মুন্নার, পেরিয়ার, কুমারকোম ইত্যাদি ইত্যাদি ।আমাদের এবারকার কেরালা ভ্রমণে এর কোনটাই ছিল না । 2011 সালে কেরালার এসব জনপ্রিয় জায়গা ঘুরে এসেছিলাম। এবারে সাইলেন্ট ভ্যালির সঙ্গে কিছু অখ্যাত জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা হলো । ট্যুর প্ল্যান ছিল এরকম - কোচি (কোচি আগে কয়েকবার গেলেও ফোর্ট কোচি দেখা হয়নি), অথিরাপিল্লি জলপ্রপাত (Athirapilly Falls), নেলিয়ামপথি (Nelliyampathy), মান্নারকাড (Mannarkad), মুক্কালি (Mukkali gateway to Silent Valley National Park) টপস্লিপ বা আনাইমালাই (Topslip),পারম্বিকুলাম টাইগার রিজার্ভ (Parambikulam Tiger Reserve) এবং কোয়েম্বাটুর। জায়গাগুলোর ইংরেজি নাম ও দিয়ে দিলাম । বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আমারও দ্বিধা আছে ।

প্ল্যান তৈরি হওয়ার পর দ্বিতীয় কাজ থাকার ব্যবস্থা করা । কোচি বা কোয়েম্বাটোর বড় শহর। থাকার জায়গার কোন অসুবিধা নেই । বাকি জায়গা গুলোর নাম দেখেই মালুম হচ্ছে যে কাজটা খুব সহজ ছিল না । বিস্তর গবেষনা করে এবং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে থাকার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সেসব গল্প যথাস্থানে বলা যাবে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা তো হলো কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম । অগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে কেরালা বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা প্লাবিত হয়ে পড়লো। বিশেষত কেরালার তামিলনাড়ু সংলগ্ন এলাকাগুলো ভালো ক্ষতি হলো। আমরা তো রীতিমতো টেনশনে পড়ে গেলাম। রোজ খবর নেওয়া শুরু হলো। যাহোক 15 সেপ্টেম্বর এর পর থেকে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করলো । 23 শে সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরুর আগে খবর পাওয়া গেল বন্যার জল সব জায়গা থেকে নেমে গেছে। বিশেষতঃ আমরা যে জায়গাগুলো যাচ্ছি ওখানে কোন সমস্যা নেই । তবে তখনো একটা শেষ চমক বাকি ছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আরো একটা ঘটনা ঘটলো, ভীরান সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হতে চাইল। আমরা যখন থেকে বনেবাদাড়ে ঘোরা শুরু করেছি তখন থেকে সফরসঙ্গী দু-একজন বাদ দিয়ে খুব একটা জোটেনা। ভীরান তামিল, চেন্নাইতে থাকে। এখন রিটায়ার্ড । অনেক বছর আগে রঙ্গতে (আন্দামান) স্টেট ব্যাংকের একই শাখায়

একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। জায়গা গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা, রোজ সাত আট কিলোমিটার হাঁটতে হবে, ওই সমস্ত দূরবর্তী জায়গায় দুপুরের খাওয়া চিড়ে, মুড়ি, শুকনো ফল ইত্যাদি দিয়ে সারতে হবে, মন্দির কোন জায়গাতেই আমাদের গন্তব্য নয় ইত্যাদি ইত্যাদি শুনেও ভীরানের উৎসাহে এতোটুকু ভাটা পড়লো না। মুশকিল এক জায়গাতে । আমাদের থাকার জায়গার booking ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। ভীরান ওর দক্ষিণ ভারতীয় কানেকশন লাগিয়ে মুন্নালি বাদে সব জায়গায় ব্যবস্থা করে ফেলল। ভীরান যাওয়াতে খুব সুবিধা হল । সাধারণতঃ এই সব জায়গাতে সূর্যাস্তের পর বিশেষ কিছু করার থাকে না। আমরা তো সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমাতে চলে যাই। ভীরান থাকায় সন্ধ্যার পর জমিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। অধিকাংশই 27 বছর আগেকার আন্দামানে থাকার সময়কার স্মৃতিচারণ। দ্বিতীয়তঃ ভীরান তামিল এবং মালায়ালাম দুটো ভাষা জানাতে আমাদের ভাষা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। নচেৎ এটা একটা ভয়ংকর সমস্যা । এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে কেরালায় সবাই ইংরেজি বা হিন্দি বলতে ও বুঝতে পারে।

দক্ষিনে বেড়াতে যাওয়ার অন্য একটা বেদনাদায়ক দিক খাওয়া-দাওয়া। বড় শহর গুলোতে সব ধরনের খাবার পাওয়া যায় । কিন্তু remote জায়গাগুলোতে সাবেক দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের উপর ভরসা করতে হয় । আমরা প্রথমদিকে অনেক রকম রাইস যেমন কার্ড রাইস, কোকোনাট রাইস, টম্যাটো রাইস, ফ্রাইড রাইস ইত্যাদি অনেক কিছু ট্রাই করে শেষ পর্যন্ত তামিল থালি মিলে স্থিতু হলাম । এটা বেশ মজাদার খাবার । কলাপাতায় পাত পেড়ে অসংখ্য অজানা নানা রঙের খাবার সাজিয়ে দেবে। গরম গরম। কোন পদ শেষ হয়ে গেলে তিন দিক থেকে তিনজন দৌড়ে আসবে আরো দেওয়ার জন্য । সতর্ক না হলে পাত আবার স্তূপীকৃত হয়ে পড়বে। আমরা বাইরে বেড়াতে গেলে রেস্তোরাঁতে সাধারণতঃ নিরামিষ খেতে পছন্দ করি। ড্রাইভারকে সেই মতো বলা ছিল। লাঞ্চ আওয়ারে খিদেয় পেট চুঁইচুঁই, ড্রাইভার দেখি অনেক আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড সহ ভালো ভালো রেস্তোরাঁ পেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি আর থামায় না । পরে জানা গেল আমিষ এবং নিরামিষ রেস্তোরাঁ আলাদা। সেখানে আমিষ খাবার পরিবেশন করা হয় নিরামিষাশীরা তার ধারের কাছে যায় না । ড্রাইভার আমাদের শুদ্ধ শাকাহারি ভেবেছে।

পর্ব 2

কোচি আমার প্রিয় শহরের মধ্যে একটা । অফিসের কাজে বেশ কয়েকবার ওখানে যেতে হয়েছে । এমনিতে বহুতল অট্টালিকা, ঝাঁ চকচকে শপিংমল, অফিসপাড়ার ব্যস্ততা, ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদি নিয়ে অন্য মেট্রোপলিসের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ নেই । তফাৎ দুটো জায়গায় । শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়া ব্যাকওয়াটার, ম্যানগ্রোভ এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ভেম্বানাদ লেক এবং অদ্ভুত সুন্দর water front. সাড়ে 4 কিলোমিটার লম্বা মেরিন ড্রাইভ, পায়ে হাঁটার পথ - গাছে গাছে ছাওয়া । বিকেল থেকেই বেশ মেলা মেলা পরিবেশ। সান্ধ্য ভ্রমনে আসা স্থানীয় লোকজন, বাইরে থেকে আসা পর্যটক, বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসে ছোট দোকানী- সব নিয়ে বেশ জমজমাট পরিবেশ । প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ছাড়ছে sunset cruise -ছোট বড় নৌকা, স্টীমার ইত্যাদি। সূর্যাস্ত দেখানোর পাশাপাশি সমুদ্রতীরবর্তী কোচির অন্যান্য বিখ্যাত জায়গাগুলো নৌকায় বসেই দেখিয়ে দেয় ।

আমাদের কেরল ভ্রমন শুরু হল কোচি দিয়ে। একটা অতিরিক্ত দিন রাখা হলো ফোর্ট কোচি দেখার জন্য । আগে কয়েকবার কোচিতে এলেও ফোর্ট কোচি দেখার সুযোগ হয়নি ।

কোচি এয়ারপোর্ট শহর থেকে প্রায় 45 কিলোমিটার দূরে। আমরা এয়ারপোর্ট থেকে সোজা মেরিন ড্রাইভ এ পৌঁছলাম সূর্যাস্তের ঠিক আগেই । ভীরানরা চেন্নাই থেকে সকালেই এসে গিয়েছিল । Sunset cruise এ বেরিয়ে পড়া গেল । অনেকবার দেখা কিন্তু প্রত্যেকবারই ভালো লাগে।

পরদিন ফোর্ট কোচি সফর শুরু হলো । দ্রষ্টব্য ফোর্ট কোচি সমুদ্র সৈকত, সান্তাক্রুজ ব্যাসিলিকা, কেরালা ফোকলোর থিয়েটার এন্ড মিউজিয়াম এবং সবশেষে দু'ঘন্টাব্যাপী backwater cruise.

ফোর্ট কোচি ইতিহাস সমৃদ্ধ। এখানে স্থানীয় রাজারা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা তাদের বসতি স্থাপন করে। বিভিন্ন স্থাপত্যে এদের প্রভাব রয়েছে । পর্তুগীজরা স্থানীয় রাজাকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করার বিনিময়ে কোচি গ্রামের ইজারা পায়। 1503 সালে এরা এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করে। পরে এই জায়গার দখল পর্যায়ক্রমে প্রথমে ডাচ এবং পরে ইংরেজদের হাতে যায় ।

কোচি বহু শতাব্দী ধরেই উৎকৃষ্ট মসলার প্রাপ্তি স্থান হিসেবে আরব এবং চীনা ব্যবসায়ীদের কাছে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত Chinese fishing net কুবলাই খানের রাজসভা থেকে আগত ব্যবসায়ীরা নিয়ে এসেছিল।

ফোর্ট কোচি বিচ, ভাস্কো-ডা-গামা স্কোয়ার এবং সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট, শতাব্দী প্রাচীন অট্টালিকা সবই পুরনো দিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। আরও একটা অদ্ভুত লক্ষ্যণীয় বিষয় - এখানকার দৈত্যাকৃতি সব প্রাচীন গাছ ই এক ধরনের আগাছায় ঢাকা। এগুলোর নাম Loranthus.

ইতিহাসে বিশেষ আগ্রহ যাদের আছে তারা দু-তিনদিন অনায়াসে এই ভাস্কো-ডা-গামা স্কোয়ারে কাটিয়ে দিতে পারে । Kerala Folklore Theatre এবং মিউজিয়াম খুবই আকর্ষণীয়। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও এরকম সংগ্রহ গড়ে তোলা যায়, না দেখলে বিশ্বাস হয়না।

এখানকার প্রত্যেকটি বাড়ী,

রাস্তা, অলি গলি শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

পর্ব 3

অথিরাপিল্লী জলপ্রপাত

অথিরাপিল্লী না দেখলে বিশ্বাস হতো না কেন একে The Niagara of India বলা হয়। ভারতের মধ্যে খুব বেশি জলপ্রপাত দেখার অভিজ্ঞতা নেই । তাই বলতে পারবো না ভারতে এর চেয়েও ভালো জলপ্রপাত আর আছে কিনা। চালাকুডি (Chalakudi) নদীর উপরে এই জলপ্রপাতের উচ্চতা মাত্র 82 ফুট, কিন্তু বিস্তৃতি 330 ফুট। বিশাল জায়গা জুড়ে যে তোড়ে জলপ্রবাহ নেমে আসে তার কোন তুলনা নেই । কান ফাটানো

আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে চারিদিকে জলীয় বাষ্পের আবরণ এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । সতর্ক না হলে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যামেরা বের করে ফটো তোলা এবং ভিডিও বানানো যথেষ্ট মুশকিলের কাজ ।

কোচি থেকে ভোর ভোর রওনা হয়ে আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা ছিল এরকম। প্রথমে অথিরাপিল্লী জলপ্রপাত দর্শন এবং পরে নেলিয়ামপথী চা বাগানে রাত্রি বাস ।

অথিরাপিল্লী কোচি থেকে মাত্র 64 কিলোমিটার । রাস্তা ভালোই। দু ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম । বাহুবলি, দিল সে ইত্যাদি সিনেমায় এই জলপ্রপাত দেখানোর পর জায়গাটা রীতিমতো জনপ্রিয় । টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়া গেল। জলপ্রপাত সংলগ্ন এলাকা চোখ জুড়িয়ে যাওয়া সবুজ। বেশ কিছু বন্য জন্তু এবং পাখি এখানে রয়েছে ।

অধিকাংশ জলপ্রপাতের মত দুভাবে একে দেখা যায়। Top view এবং floor view। আধ কিলোমিটার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেশ কিছুটা পাথুরে পথ পেরিয়ে ফ্লোর ভিউ পয়েন্টে পৌঁছাতে হয় । ফেরার সময় এই চড়াই ভেঙ্গে উঠে আসা বেশ কষ্টকর। কিন্তু নিচে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখা এবং অনুভব করা যায় তার কোন তুলনা নেই। জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে আছাড় খাওয়া আমার রুটিন হয়ে গেছে । আগে দুধ সাগর দেখতে গিয়ে ankle sprain হয়েছিল । এবারে পিছল সিড়ি দিয়ে নামার সময়ে পপাতঃ ধরণীতলে। একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর ব্যাথা একটু কম হলেও, পরে এক্সরে করে জানা গেল 9th rib এ crack হয়েছে । ব্যথা পুরোপুরি কমতে কয়েক মাস লেগেছিল ।

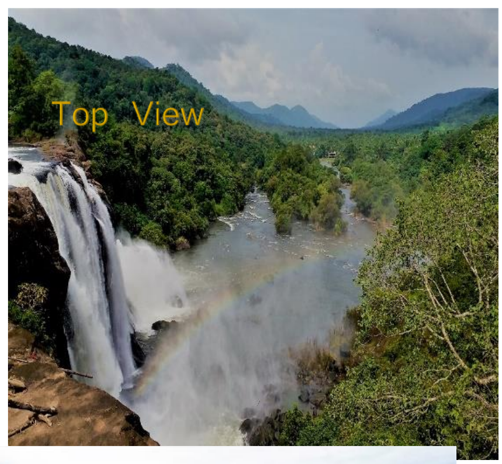

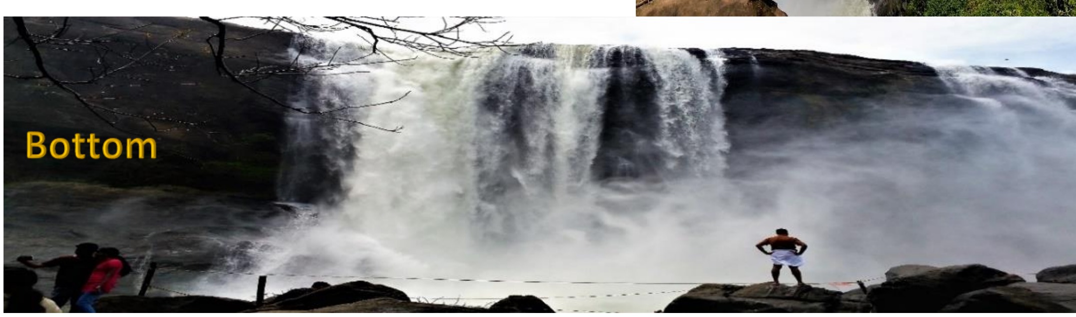

পর্ব 4

আমাদের পরের গন্তব্য Nelliyampathy। নামগুলো সব ইংরেজিতেই লিখছি। সঠিক উচ্চারণ কি হবে কে জানে। Nelliyampathy, Nenmara, Pothundi, Chalakudy এসব কি আগে থেকে শোনা নাম? আমিও আগে কখনো শুনিনি। কেরালার কম জনপ্রিয় জায়গা গুলো নিয়ে travel plan বানাতে বসে এরকম অনেকগুলো রোমাঞ্চকর জায়গার খোঁজ পাওয়া গেল ।

বিলাসবহুল হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে যদি সেরকম আগ্রহ না থাকে, ভাঙাচোরা পাহাড়ি রাস্তা আর সন্ধ্যের পর চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, মাঝে মাঝে ভেসে আসা অদ্ভুত সব আওয়াজ, মশা আর জোঁকের উপদ্রব যদি আপনাকে সে রকম অসুবিধায় না ফেলে তাহলে পশ্চিমঘাট এর অন্দরে কন্দরে এরকম অনেক মনি মুক্তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেকদিন আগে Trip Advisor এ Ciscilia Heritage নামের একটা অখ্যাত চা বাগানে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে রিভিউ পড়েছিলাম । ভালো লেগেছিল। সেই জায়গার সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর করতে গিয়ে Nelliyampathy ইত্যাদি জায়গার নাম উঠে এল। Nelliyampathy Pallakad জেলা শহর থেকে 60 কিলোমিটার দূরে অখ্যাত শৈল শহর । গরীব লোকের মুন্নার বলেও পরিচিত। চা বাগান, Coffee Estate, কিছু Home Stay আর গুটিকয়েক দোকান ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই । Nenmara থেকে 27 কিলোমিটার সর্পিল পাহাড়ি পথ ধরে উঠে আসতে হয়। সন্ধ্যা 6 টার পর এ পথে গাড়ী চালানো নিষেধ। রাস্তা সরু এবং খারাপ। তাছাড়া সন্ধ্যার পর হাতি এবং অন্যান্য বুনো জন্তুর আনাগোনা বেড়ে যায় । Padagiri পাহাড়ে এই চিরহরিৎ অরণ্য আর দৈত্যাকৃতি সব মহীরুহ সমীহ আদায় করে নেয়। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে একরের পর একর কফি এস্টেট, চা বাগান, ফলের বাগান, গোল মরিচ, দারচিনি, এলাচ এবং অন্যান্য মশলাপাতির চাষাবাদ হচ্ছে। সঙ্গে উপরিপাওনা হালকা কুয়াশা জড়ানো ছবির মত দৃশ্যপট এবং অসংখ্য ছোট বড় জলাশয়। এর মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি view point ।

আমাদের থাকার জায়গা Ciscilia Heritage, Ranimedu Tea Estate এর মধ্যে গোটা ছয়েক রুম নিয়ে ছোট্ট Home Stay তে। Nelliyampathy থেকে 5 কিলোমিটার দূরে, কাঁচা রাস্তা, বিশেষত পাহাড়ের মাথায় পৌঁছানোর শেষ দুই কিলোমিটার যেটা চা বাগানের নিজস্ব রাস্তা, SUV ছাড়া পার করা মুশকিল। Home Stay ঘন জঙ্গলের মধ্যে। আশেপাশের সব গাছে Nilgiri Langur and Giant Malabar Squirrel এর দাপাদাপি দেখেই সময় কেটে যায়। পাখিও অনেক । Laughing Thrush, Woodpecker, Plum Headed Parakeet, Black Headed Oriole, Nilgiri Flycatcher এবং নাম-না-জানা আরো অনেক রকম পাখি। থাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সাধারণ। আরো একটা সাবধান বাণী। বর্ষা শেষ হওয়ার পরপরই আমরা গেছিলাম। জোঁকের উপদ্রব রয়েছে। আমাদের group এর দুজনকে বাধ্যতামূলক রক্তদান করতে হলো । ফেরার সময় Pothundi Dam দেখতে গেলাম। খুব সুন্দর জায়গা।

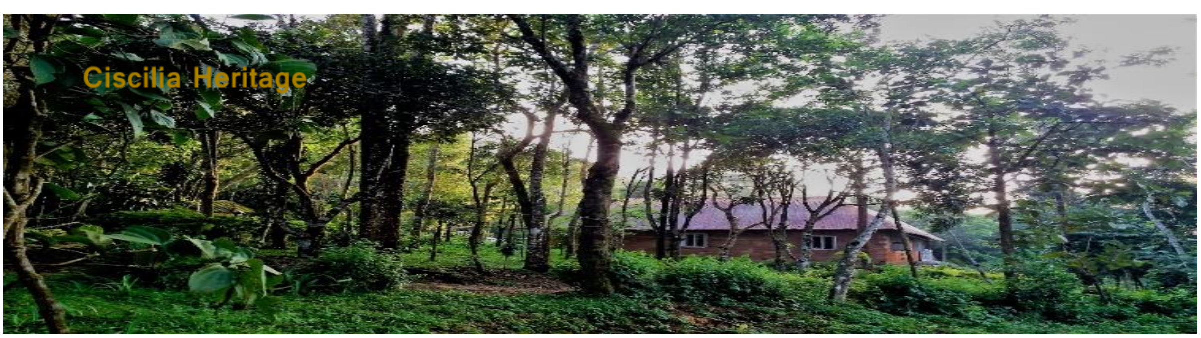

Shade trees create
beautiful pattern. Breaks monotony. Looks like a painting on canvas.

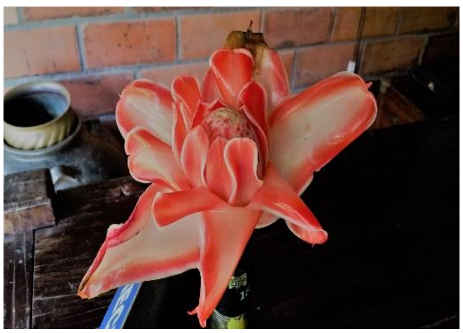

Dining Hall এর কর্মচারীরা এই ফুলের মালয়ালাম নাম বলেছিল। গাছ থেকে তোলার পর এক সপ্তাহ তাজা থাকে। পরে জানলাম এর নাম *Philippine waxflower.*

পর্ব 5

পরের গন্তব্য Mannarkkad । Mannarkkad এমনিতে একটা অখ্যাত ছোট জায়গা । এর একমাত্র গুরুত্ব এটা সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের gateway. বনবিভাগের সদরদপ্তর এখানে রয়েছে। Mukkali তে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের এন্ট্রি পয়েন্ট এখান থেকে মাত্র 30 কিলোমিটার ।

এ দিনে আমাদের plan ছিল এরকম। Ciscilia Heritage, Nelliyampathy থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে ধীরেসুস্থে একটু দেরী করেই বেরোলাম । প্রথম বিরতি Pallakad এ। দূরত্ব 95 কিলোমিটার, সময় লাগলো তিন ঘন্টার একটু বেশি। Pallakad জেলা শহর । এর পরিচিতি কেরালার শস্য ভান্ডার হিসেবে। বর্ধমানের মত এই জায়গা দেশের অন্যতম উর্বর স্থান। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে মাইলের পর মাইল সবুজ শস্যক্ষেত খুব ই দৃষ্টিনন্দন । মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে রওনা হওয়া গেল Malampuzha Dam এর উদ্দেশ্যে। বাংলা উচ্চারণ বোধহয় মালামপুড়া। Malampuzha কেরালার সবচেয়ে বড় dam এবং reservoir । Reservoir ঘিরে একটা বিশাল বাগান রয়েছে।

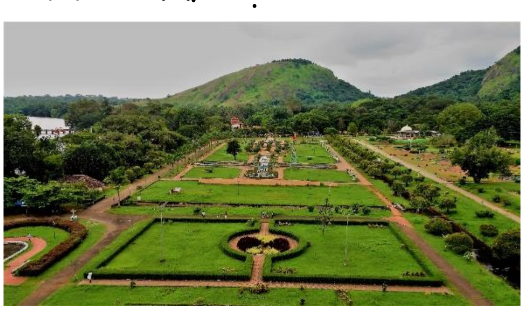

চোখ জুড়িয়ে যায় । কেরালা ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ এই dam গুলো। ছোট-বড় মিলিয়ে মোট 42 টা dam রয়েছে। প্রত্যেকটাই পর্বতবেষ্টিত, উদ্যানশোভিত- অনেক গুলোতে নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে। Yakshi Garden, Japanese Garden, Cable Car ride, fish shaped acquarium ইত্যাদি নিয়ে জমজমাট বন্দোবস্ত । এখানে 30 ফুট উঁচু Yakshi

এর মূর্তি রয়েছে । 1969 সালে স্থাপিত। ভাস্কর স্বনামধন্য Kanayi Kinhiraman. আক্ষেপ রয়ে গেল মেরামতির কাজ চলার জন্য এই মূর্তি দেখা হলো না। যারা আগ্রহী তারা Yakshi, the iconic statue of Kerala এই নামে গুগল সার্চ করে দেখতে পারে ।

এরপর আমরা গেলাম Kanhirapuzha Dam দেখতে। Malampuzha থেকে 38 কিলোমিটার । দেড় ঘন্টা লাগল। এটাও খুব সুন্দর তবে Malampuzha র তুলনায় অনেক ছোট । সন্ধ্যার মুখে Mannarkkad এর একটা হোটেলে check in করা গেল। গোটা ট্রিপে এই এক রাত ই হোটেলে থাকা ।

Plaque is quite interesting. Kerala at that point of time was part of Madras State. Unveiled by Mr K Kamaraj the Chief Minister of Tamilnadu back then.

পর্ব 6

পরের গন্তব্য সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক । কেরালা tourism এর ওয়েবসাইটে এর বর্ণনা এরকম রয়েছে

Extremely fragile, unique preserve of tropical evergreen rainforest, which is veritable nursery of flora and fauna, some of which are found nowhere in the world.

অবশ্য এর খুব সামান্য অংশেই আমাদের মত সাধারন ট্যুরিস্টদের যেতে দেওয়া হয় । আগেই লিখেছি যে তিন মাস আগে থেকেই এখানে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুরো দু দিনের programme যার মধ্যে দুটো জনপ্রিয় trail walk- Karvara Fall Trek এবং Keerippara Trek. দুটোতেই গাইড সঙ্গে করে যেতে হয়, খুব বেশি পাহাড়ে চড়া নেই অর্থাৎ আমাদের সাধ্যের মধ্যে । অনেক তদ্বির করে Mukkali তে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকশন বাংলোতে দু দিনের booking করেছিলাম। নচেৎ এখানে থাকার জায়গা জোগাড় করা রীতিমতো ঝামেলার কাজ। সবচেয়ে কাছাকাছি মোটামুটি ভালো থাকার জায়গা 30 কিলোমিটার দূরে Mannarkkad এ। ওখানে থাকলে খুব ভোরে শুরু হওয়া trail walk ইত্যাদি তে যোগদান করা মুস্কিল হয়।

এরপরের কাহিনী খুবই দুঃখজনক এবং হতাশাব্যঞ্জক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এতদিনের তৈরি পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। Mannarkkad থেকে Mukkali যাওয়ার 30 কিলোমিটার রাস্তার পুরোটাই পাহাড়ি পথ, এখানকার ভাষায় ঘাট রোড। যাওয়ার সময় বিভিন্ন জায়গায় ধস নামার চিহ্ন প্রায় কয়েক কিলোমিটার অন্তর চোখে পড়ছিল। আমাদের মনে সাইলেন্ট ভ্যালি পার্ক খোলা থাকা বা না থাকার ব্যাপারে একটা আশঙ্কা ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছিল। ওখানে পৌঁছে জানা গেল যে প্রবল বৃষ্টি এবং ধস নামার কারণে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক 15 দিনের জন্য বন্ধ। এর থেকে হতাশাজনক খবর আর কি হতে পারে ? দুদিনের পরিবর্তে

একদিন থেকে Mukkali এবং এর আশ পাশ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। Mukkali ছোট্ট জায়গা। গুটিকয়েক বাড়ি আর দোকানপাট ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের থাকার জায়গা ফরেস্ট বাংলো ভবানী নদীর ধারে খুব সুন্দর জায়গায় । অনেক গাছপালা নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার ক্যাম্পাস। আশেপাশের সব বড় গাছগুলোতে Malabar Giant Squirrel আর Malabar Parakeet দের দৌরাত্ম্য চলছে। বাইরে বেরিয়ে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কয়েক কিলোমিটার হাঁটা হল।

ভবানী নদীর ধারে ফরেস্ট বাংলো

Silent Valley Park entrance. Otherwise bustling area, wearing a deserted look because of Park closure

পর্ব 7

অতিবৃষ্টি এবং ধস নামার কারণে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক বন্ধ থাকার কথা আগের পর্বে লিখেছি। তাই Mukkali তে দুদিনের ভ্রমনসূচী কাটছাঁট করে একদিন আগেই আমরা Pollachi র দিকে রওনা হয়ে গেলাম। দূরত্ব 104 কিলোমিটার। তিন ঘন্টা লাগল । Pollachi তামিলনাড়ুতে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য Top Slip এবং Parambikulam Tiger Reserve যাওয়ার পথে শেষ শহর।

এবারের লেখা Top Slip নিয়ে যার পোষাকি নাম Anaimalai টাইগার রিজার্ভ। Anaimalai পর্বত শ্রেণীর মধ্যে প্রায় 1000 বর্গ কিমি জুড়ে শাল সেগুনের নিবিড় অরণ্য। এটি একটি স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ইংরেজ আমলে পাহাড়ের উপর থেকে সেগুন গাছের গুড়ি গড়িয়ে নীচে ফেলা হতো বলে এই জায়গার নাম হয়েছে Top Slip. এখানেই রয়েছে বিখ্যাত Kozhikamuthi Elephant Camp- হাতিদের Training College 😃. ভারতের সবথেকে বেশি সংখ্যক কুনকি হাতি এখানে রয়েছে। National Park এর একটা অংশে Medicinal Plant এর একটা বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়েছে ।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা Tree Top Hut এ। চারটে গাছের মগডালে চমৎকার থাকার বন্দোবস্ত। সামনের রাস্তা Parambikulam National Park এর দিকে চলে গেছে। অন্য তিন দিকে ঘন জঙ্গল । খাওয়ার জায়গা এবং ফরেস্ট অফিস থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে। বেশ রোমাঞ্চকর । অবশ্য রাতে একটা ছোট্ট টর্চ সম্বল করে এই আধ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে ডাইনিং হলে খেতে যাবার সময় গা ছমছম করতে লাগলো। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে কয়েক শো জ্বলজ্বলে চোখ দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম ফরেস্ট অফিসের সামনে ঘাসের লনে চিতল হরিণ এর একটা বিশাল দল ঘাস খাচ্ছে। ভাল ক্যামেরা থাকলে অসাধারণ ভিডিও তোলা যেত । অবশ্য তখন যেরকম হৃদকম্প হচ্ছিল ক্যামেরা স্থির করে ধরে রাখাটাই মুশকিল হত। Dining Hall এর আশেপাশে কিছু বুনো শূয়োরের চলাফেরা দেখা গেল। এগুলো কিন্তু খুব নিরীহ নয় । তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দুরু দুরু বক্ষে হাটে ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মাঝরাতে বেশ কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল জঙ্গলের মধ্যে থেকে আসা অদ্ভুত সব আওয়াজে । নাইটজার আর প্যাঁচার ডাক ও হুটোপাটীতে বাকী ঘুমের দফারফা ।পরদিন ভোরে বেরিয়ে ক্যাম্পাস টা ভালো করে ঘুরে দেখলাম । Tree Top Hut ছাড়াও অনেক রকম থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সবকিছু খুব সুন্দর সাজিয়ে রাখা। Forest Department এর একটা Safari তে বেরিয়ে হাতি, বাইসন, বুনো শুয়োর, হরিন সব ই দেখা গেল। আমাদের বাঘ দেখার ভাগ্য বরাবর ই খারাপ। তাতে অবশ্য খুব একটা আক্ষেপ নেই। এই Safari এর শেষে elephant camp এ নিয়ে যায়। চমৎকার জায়গা।

Reception area এর সামনে অনেকখানি ঘাসজমি। রাতে খেতে যাওয়ার সময়ে এখানে কয়েকশো চিতল হরিণের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেছিলাম।

Elephant camp এ তোলা আমার প্রিয় ছবি। ঠিক সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার মুখে, স্বর্গীয় প্রকৃতির মাঝে একদল ছেলে ভলিবল খেলায় মত্ত।

পর্ব ৪

এবারের সফরে আমাদের শেষ গন্তব্য Parambikulam টাইগার রিজার্ভ । এর পরে আমরা কোয়েম্বাটুর এ এক রাত থেকে পরদিন মুম্বাই এর ফ্লাইট ধরেছিলাম।

Parambikulam টাইগার রিজার্ভ এর অবস্থান অদ্ভুত। এটি কেরালায় অবস্থিত হলেও কেরালার কোন জায়গা থেকে সরাসরি এখানে পৌঁছানো যায় না। আসার একমাত্র রাস্তা Top Slip হয়ে যা তামিলনাড়ুর মধ্যে। যারা কেরালার গাড়ী book করবেন (যেমন আমরা করেছিলাম) তাদের তামিলনাড়ুতে প্রবেশের জন্য স্পেশাল পারমিট করার দরকার হবে।

Nelliyampathy এবং আনাই মালাই পাহাড়ের মধ্যে 406 বর্গকিলোমিটার জুড়ে প্রধানত পর্ণমোচী এই অরণ্য কে 2009 সালে টাইগার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এর ব্যবস্থাপনায় এখানকার buffer zone এ অনেক রকম ইকোট্যুরিজম অ্যাক্টিভিটির ব্যাবস্থা আছে। যেমন অভিজ্ঞ guide এর সঙ্গে trekking, bird watching, bamboo rafting, safari ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে থাকার জন্য ব্যবস্থা অনেক রকম। Parambikulam check post এর কাছে যেখানে কেরালা forest department এর office ইত্যাদি রয়েছে, সেখানে রয়েছে tent complex. এছাড়া এখান থেকে 15 কিমি দূরে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে অন্য guest house এবং tree top hut. এর মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় Thunacadavu তে সুবিশাল Lake এর ধারে tree top hut. প্রায় জনমানব বর্জিত এই থাকার জায়গা অবস্থান মাহাত্ম্যে অসাধারণ। আমরা এর বুকিং জোগাড় করতে পারলাম না । Tent কমপ্লেক্সে এক রাত থাকলাম । এই জায়গাটা ও খুব সুন্দর। অনেকটা জায়গা জুড়ে অনেক গাছ পালা নিয়ে চমৎকার থাকার ব্যাবস্থা। কমপ্লেক্স এর মধ্যে অনেক ময়ূর এবং চিতল হরিণ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারম্বিকুলাম টাইগার রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে Thunacadavu dam এবং বেশ কয়েকটি বিশাল জলাধার । দেশ-বিদেশে বেশ কয়েকটা রিজার্ভ ফরেস্ট এবং ন্যাশনাল পার্কে ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নিপুন ব্যবস্থাপনার নিরিখে এই পার্ক সবচেয়ে উপরের দিকে জায়গা করে নেবে। বর্ষা শেষ হওয়ার পরপরই অরণ্য নিবিড় সবুজ এবং সতেজ । চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমাদের থাকার জায়গা ছিল যথেষ্ট মহার্ঘ্য। অবশ্য এই প্যাকেজে দুজনের থাকা-খাওয়া ছাড়াও জঙ্গল সাফারি, ট্রাইবাল ডান্স প্রোগ্রাম, bamboo rafting এবং পরের দিন সকালে গাইডসহ trekking এবং bird watching অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবগুলোই খুব উপভোগ্য ।

পারাম্বিকুলাম টাইগার রিজার্ভ এর প্রবেশদ্বার

টেন্ট কমপ্লেক্স। আমাদের থাকার জায়গা।

Thunacadavu Tree Top Hut এই লেকের ধারে। পারাম্বিকুলামে সব চেয়ে ভালো থাকার জায়গা।

ভোরে গাইডের সঙ্গে পাখি দেখতে বেরিয়ে প্রথমে যা নজর কাড়লো।

Serious birding with a guide.

তাপস সরকার পেশায় ব্যাংক কর্মচারী। ছোটবেলা কেটেছে আসানসোলে। গত , 10 বছর কর্মসূত্রে মুম্বাই নিবাসী। শখ বই পড়া, বেড়ানো এবং birding. পাহাড় ও জঙ্গল সবচাইতে পছন্দের। কোলাহল বিহীন নির্জন সমুদ্র সৈকত ও ভালো লাগে। চাকরি জীবনের শুরুতে পোর্টব্লেয়ার থেকে 200 কিলোমিটার দূরে সুদূর মায়াবন্দরে তিন বছর কাটানোর অভিজ্ঞতা স্মৃতির মণিকোঠায় এখনো অমলিন। লেখালেখির অভ্যাস বিশেষ একটা ছিল না। গত বছর লকডাউন চলাকালীন একদল ভ্রমণপাগল বন্ধুদের নিয়ে পুরনো ভ্রমণ অভিজ্ঞতা share করার মাধ্যম হিসেবে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়। বন্ধুদের আবদারে লেখা শুরু । এই লেখাটাও সেই ভাবে লেখা – কয়েকটা পর্বে ঘরে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মোবাইলে টাইপ করে।

মায়ের খাতা

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

আমাদের মা ভারতী মুখার্জির শৈশব, কৈশোর, ও যৌবন কেটেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে । সেই সময়ে বাংলার ছাত্ররা মেতে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে, ...অবিভক্ত বাংলা জেগে উঠেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে..দেশ মাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার আশায় । আবার প্রায় সমসাময়িক কালে সুরু হয়েছিল পুরনো দিনের কলকাতার সাংস্কৃতিক নবজাগরণ । মা ছিলেন এই সময়কালের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী । পারিপার্শ্বিকতার প্রতি গভীর আগ্রহে ও মানুষের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে মা নিজের জীবনের অনেক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন । মার ডায়েরি থেকে মার লেখা কিছু ঘটনা অবিকল তুলে দিলাম কোনও কোনও পাঠকের ভাল লাগার আশায় । মায়ের লেখা তথ্যগুলির সঙ্গে পাঠকের যদি মতের তারতম্য হয়, এই ভেবে আগে থেকেই পাঠকের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

ভারতী মুখার্জি

খুলনা

আমার ছেলেবেলায় আমরা খুলনায় থাকতাম । পূর্ববাংলার একটি অতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন সহর । তখন ব্রিটিশ রাজত্বে খুলনা ছিল গ্রামের গ্রাম্য সৌন্দর্য ও সহরের সবরকম সুবিধা নিয়ে তৈরি । দুটো বড় নদী সহর টা কে ঘিরে ছিল, আমাদের বাড়ির কাছে ছিল রূপসা, রূপসাগর থেকে মুখে মুখে রূপসা হয়েছে । যে যশোর রোড দিয়ে আমরা দমদম এয়ারপোর্টে যেতাম সেই যশোর রোড শেষ হয়েছে রূপসার ধারে । সহরের আরেক প্রান্তে ভৈরব, ভৈরবকে সকলে নদ বলতো , নদী নয় কেন জানিনা । বোধহয় তার বিক্রমের পরিচয় পেয়ে, অত্যন্ত উচ্ছল ঢেউয়ে ভরা নদী, প্রায়ই পাড় ভেঙে নিয়ে চলে যায় ।

আমার বাবা খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন । তিনি হিন্দু হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন । স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন । খুব সম্ভব সেটা ১৯০৭ সাল , তখন আর্টস সায়েন্স আলাদা ডিগ্রী হয়নি, বাবা ফিজিক্সে এম এ পাশ করে আইন পড়েছিলেন । বাবা স্যর পি সি রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, তাঁর দেশ ছিল খুলনা জেলার রাঢুলি গ্রামে, সেখানে যেতে হলে খুলনা দিয়ে যেতে হয়, যখনই তিনি দেশে যেতেন খুলনায় দু তিন দিন থেকে যেতেন, তিনি তাঁর থাকার ব্যবস্থা করার জন্য বাবাকে চিঠি লিখতেন, আমি একবার আমার খাতায় তাঁকে কিছু একটু লিখে দিতে বলেছিলুম, তিনি লিখেছিলেন, 'খদ্দর পরিবে, চরকা কাটিবে '।

মহাত্মা গান্ধী একবার খুলনায় গিয়েছিলেন, সাল তারিখ আমার মনে নেই শুধু এইটা মনে আছে তার আগের দিন দেশবন্ধু মারা গেছেন, আমরা তখন খুব ছোট, যে মাঠে সভা হয়েছিল সেখানে এত ভিড় হয়েছিল যে ঢুকতে না পেরে আমি আর দিদি বাড়ী ফিরে মুখ ভার করে বসেছিলুম । বাবা মিটিং এ ছিলেন ফিরে এসে সব শুনে আমাদের নিয়ে গেলেন যে বাড়ীতে মহাত্মা রয়েছেন সেখানে । আমরা তাঁকে প্রণাম করলুম, তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন । তাঁকে একটা পাথরের গেলাসে ফলের রস খেতে দেওয়া হোল, তিনি আর দুটো পাত্র চেয়ে নিয়ে আমাকে ও দিদিকে একটু করে ফলের রস ঢেলে দিলেন , আর বললেন বড় হয়ে যেন সবরমতী আশ্রমে যোগ দিই ।

সে সময় খুলনা, বরিশাল বিপ্লবী ছেলেদের ঘাঁটি ছিল । সেটা খুব সম্ভব ১৯৩০ বা ১৯৩১ সাল । বাংলায় তখন বিপ্লবী ছেলেরা সাহেব খুন করে বেড়াচ্ছে । সেইজন্য সব ইংরেজ ও বাঙালী উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দুজন করে পাঠান গার্ড থাকতো রিভলভার নিয়ে, যে কেউ তাঁদের বাড়ী যেত তখনই ওরা চেঁচিয়ে উঠত 'হল্ট' বলে, যে যাচ্ছে তাকে হাত তুলে বলতে হোতো 'ফ্রেন্ড' । তখনকার দিনে ইংরেজকে খুন করে অনেক বিপ্লবী ফেরার হতেন । খুলনায় বাড়ী বাড়ী সার্চ করে পুলিশ তাঁদের খুঁজে বেড়াতো ।

মোক্ষদা দেবী

আমরা মাঝে মাঝেই কিছুদিন করে কলকাতায় কাটিয়ে যেতাম, কলকাতার বৌবাজারে ছিল আমাদের মামার বাড়ি । বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডাবল্যু সি ব্যানার্জি ছিলেন দাদুর মামা , মানে মার ঠাকুমা ছিলেন ডাবলু সি ব্যানার্জির পরের বোন, মার ঠাকুমাকে আমরা বড়মা বলতুম । আমরা তাঁর পৌত্রীর মেয়ে হলেও তাঁকে খুব সক্ষম দেখেছিলুম । সে সময়ের কলকাতার অন্যতম ধনী বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্রের সঙ্গে বড়মার বিয়ে হয়েছিল । তখন কলকাতার বৌবাজারে কোনও বাজার ছিলনা, বিশ্বনাথ মতিলাল সেখানে একটা বাজার বসিয়ে তাঁর পুত্রবধূকে যৌতুক দিয়েছিলেন, বৌয়ের বাজার এই কথা থেকে ঐ পাড়ার নাম হয় বৌবাজার । বড়মার কোন ডিগ্রী না থাকলেও খুবই শিক্ষিত ছিলেন । দাদুর সংসারে তিনিই কর্ত্রী ছিলেন ও অতি পরিপাটি করে সংসার চালাতেন । সন্ধেবেলা বড়মা বসে সুপারি কাটতেন , সে সময় কত নাম করা গণ্য মান্য লোক যে তাঁর কাছে বেড়াতে আসতেন তার ঠিক ছিলনা । বড়মার নাম ছিল মোক্ষদা দেবী, তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতমা, বনপ্রসুন বলে তাঁর কবিতার বই বেরিয়েছিল । কোন পত্রিকাতে মনে নেই , কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী মেয়েদের বিদ্রুপ করে কবিতা লিখেছিলেন; ***খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে, যায় যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে*** । এই রকম একটি খুব বড় কবিতা, আমার শুধু দুলাইন মনে আছে । বড়মা একটি বড় কবিতা লিখে এর উত্তর দিয়েছিলেন, যার থেকে দুলাইন হোল; ***কোঁচা দুলাইয়া খায় দুধ সাবু, যায় যায় ঐ যায় বাঙালীর বাবু*** ।

বিনোদ ব্রহ্মচারী

সেবারে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থেকে আমরা খুলনায় ফিরে এলাম । সে সময় রূপসা নদীর অন্য পারে ভারত সেবা-শ্রম সঙ্ঘের প্রথম আশ্রম ছিল , খান-কতক বড় বড় আটচালা ঘর ও অনেকটা জমি নিয়ে । স্বামী প্রণবানন্দ এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তিনি সেখানে এসেছেন ও অনেক সাধু নিয়ে উৎসব করছেন শুনে একটা নৌকা ভাড়া করে আমার দুই ঠাকুমা আমি ও আমার সেজ-বোন শ্রীলতা রূপসা পার হয়ে সেখানে গেলাম । গিয়ে দেখি একটা জলচৌকির ওপর স্বামী প্রণবানন্দ বসে আছেন ও তাঁর দুটি পা একটা তামার পাত্রের ওপর ঝুলে আছে, সেই পায়ের ওপর ভক্তরা ফুল বেলপাতা কাঁচা দুধ অনবরত দিচ্ছেন -সেই চরণামৃত সকলকে দেওয়া হচ্ছে ।

স্বামী প্রণবানন্দকে খুলনার লোক বিনোদ ব্রহ্মচারী বলে উল্লেখ করতো । আমরা তাঁকে প্রণাম করে ঘুরে ফিরে সব দেখে দাওয়ায় বসে কলাপাতায় গরম খিচুড়ি ভোগ খেয়ে বাড়ী ফিরি ।

ব্রতচারী নাচ

তখন ১৯৩৪ কি ৩৫ সাল , গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস খুলনায় তাঁর ব্রতচারী সঙ্ঘের প্রচার করতে গিয়েছিলেন । করোনেশান হলে ব্রতচারী সঙ্ঘের ছেলেরা সুন্দর নাচলে ।

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
যত আধি ব্যাধি বলবে পালাই পালাই ।।

মেয়েরাও সুন্দর নেচেছিল , গুরুসদয় দত্ত মাঠে নেমে গিয়ে নিজে কোদাল নিয়ে মাটি কোপাতে সুরু করেন, এই সঙ্গে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য অফিসারেরা দল বেঁধে ছুটলেন । মিঃ দত্ত মাটি কুপিয়ে একটা ঝুড়িতে ভরে ম্যাজিস্ট্রেট বি. বি সরকার কে ডেকে বললেন ***বসন্ত যাও এই ঝুড়িটা মাথায় করে মাটিগুলো ফেলে দিয়ে এস ,*** মিঃ সরকার একটুও দ্বিধা না করে ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিলেন । দু তিন জন ডেপুটি সাহায্য করতে ছুটে এলেন , মিঃ দত্ত তাঁদের জোরে ধমক দিয়ে সরে যেতে বললেন । দামী স্যুটে বুটে সজ্জিত খুলনা জেলার হর্তা কর্তা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি সরকার আই, সি, এস প্রচণ্ড রৌদ্রে একঝুড়ি মাটি মাথায় করে বেশ খুশি মনেই ফেলতে চলে গেলেন । এ সব আমার নিজে চোখে দেখা কিছু অতিরঞ্জিত নয় ।

পুরানো কলকাতা

১৯৩৫ সাল থেকে আমরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসি । ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনের মেয়েরা নিউএম্পায়ারে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করলে, আমরা দেখতে গেলাম । তার কিছুদিন পরে পরিশোধ নৃত্য-নাটক হোল আশুতোষ কলেজ হলে , পরিশোধের নাম পরে শ্যামা করা হয় , দুজায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া স্টেজে বসেছিলেন । পরিশোধে রবীন্দ্রনাথ দে দোল্, দে দোল্, কবিতাটি আবৃত্তি করেন, সেই-সঙ্গে তাঁর নাতনী নন্দিতা নাচলে, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম । অভিনয় হবার ১৫ দিনের মধ্যে আমি চিত্রাঙ্গদার দুটি গান অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে গেয়েছিলাম । YWCA তে একটা গানের জলসায় আমরা গান করেছিলুম আর সেখানে পরিচয় হয় পরবর্তীকালের খ্যাতনামা অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অরুন্ধুতি গুহঠাকুরতা ও দক্ষিনী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শুভ গুহঠাকুরতার সঙ্গে । এর পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘে, জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর বাড়ীর বিচিত্রা ভবনে, মাঘ উৎসবে, এবং আরও অন্যান্য কলকাতার অনুষ্ঠানে আমরা কয়েকজন রবীন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী ছেলেমেয়ে; অরুন্ধুতি, শুভ, জর্জ বিশ্বাস, সবাই একসঙ্গে শৈলজারন্জন মজুমদার ও অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় গান গেয়েছি ।

ভাল সিনেমা এলে আমরা ভাইবোনেরা আমাদের কাজিনদের সঙ্গে দল বেঁধে দেখতে যেতুম, মিউজিক কনফারেন্সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনা এবং আর্ট এগজিবিশনে ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও হোতো আমাদের । তখন সাদার্ন এ্যাভিন্যুতে সবে খোয়া দেওয়া হয়েছে , পিচ পড়েনি, এক একদিন আমরা তার ওপর হাঁটতে যেতুম । নতুন ডিজাইনের ছাদ করে মেট্রো সিনেমা হল সবে হয়েছে , তখনই মেট্রোর ছাদের ডিজাইনের হার বেরিয়ে গেল নাম হল মেট্রো হার । মেট্রো সিনেমা হলই বোধহয় কলকাতায় প্রথম এয়ার কন্ডিশন করা সিনেমা হল ।

সেই সময়ে কলকাতারই বা কি সুন্দর রূপ ছিল , যেমনি ভাল আইন শৃঙ্খলা তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । রোজ ভোরে পাইপ দিয়ে জল দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করে দেওয় হোতো । পরিষ্কার ফুটপাথ , দুধারে চওড়া

রাস্তা, মাঝখানে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর ট্রামলাইন পাতা, ফুটপাথে কিছু দূর অন্তর গাছ, রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর কি রূপই ছিল । সাদার্ন এ্যাভিন্যুতে কিছু দূর পর্যন্ত নীল আলো, কিছু দূর পর্যন্ত হলুদ আলো, এইভাবে সাজানো, সন্ধ্যাবেলা মেলা বসে যাবার মতো ভিড় হোতো ,লেকের ধারে , সাদার্ন এ্যাভিন্যুতে । বেলফুলের মলা, রজনীগন্ধার পাখা এইসব বিক্রি হোতো , কতরাত অবধি লোকজন বেড়াত কোনও ভয় নেই । জিনিষপত্রও কি সস্তা পাঁচ পয়সা ডিমের জোড়া, তিন টাকাতে সুন্দর তাঁতের শাড়ী ।

রবীন্দ্রনাথ

এই সময় আমরা সবাই মিলে ৭ই পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম । রাত্রিবেলা শান্তি-দেব ঘোষের পরিচালনায় আশ্রমের ছেলেমেয়েরা আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে ওই বাজে গানটি গাইতে গাইতে আশ্রম ঘুরে পরিক্রমা করছে, আমি আর আমার মামাতো বোন অঞ্জলি তাদের পিছন পিছন যেতে লাগলুম, তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে আমরা আমাদের থাকার জায়গা হারিয়ে ফেললুম, আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল শ্রী ভবনে । তখন ওই গানের দলের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই , আমরা নতুন কিছুই চিনিনা , রাত অনেক হয়েছে । গান শেষ হলে দেখা গেল দলের মধ্যে কিছু মেয়ে ছিল যারা শ্রী-ভবনে থাকে , তাদের সঙ্গে আমরা ফিরে এলুম । পরদিন ৭ই পৌষ উৎসব, মন্দিরের সামনে কণিকার সঙ্গে দেখা,কণিকা র ডাকনাম মোহর, আগে থেকেই বন্ধু ছল আমাদের, সে ছুটে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে নিয়ে চললো । কণিকার কোনও অনুমতি লাগেনা , সে আমাকে নিয়ে সটান দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে গেল । দেখলুম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সুন্দর সোনার বরণ মূর্তি, প্রণাম করে পাশে দাঁড়ালুম । কণিকা অনর্গল আমাদের গানের কথা বলে যেতে লাগলো । কবি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এখানে আসবে ? আমি হ্যাঁ বলার মত ঘাড় নাড়লুম কথা বলার ক্ষমতা ছিলনা , কবি কণিকাকে বললেন দ্যাখ না একটা স্কলারশিপ খালি আছে । সুধাকান্তবাবু আমাদের দুজনকে দুমুঠো লেবু লজেন্স দিলেন । অনিচ্ছা সত্বেও ফিরতে হোল, সেই লজেন্স আমি অনেকদিন রেখে দিয়েছিলুম ।

গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে তাঁর গানের বই গীতালির নামে একটি সম্মেলন মতো প্রতিষ্ঠা করেন । গায়ক সমরেশ চৌধুরী তার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। আমরা চেয়েছিলাম এই সম্মেলনও গান গাইতে তবে আমরা কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এত নামজাদা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার সুযোগ পাইনি, তাই শুভ গুহঠাকুরতার প্রবল ইচ্ছা, উদ্দীপনা ও পরিশ্রমে ও আমাদের সবাইকার ঐকান্তিক চেষ্টায় ,আমরা গীতবিতান বলে নিজেদের গনের স্কুল খুলি । সেই সময় শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার কোন প্রতিষ্ঠানই কলকাতায় ছিলনা । রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের আসরে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান হোতো, পঙ্কজ মল্লিক ও হেমন্ত মুখার্জি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন রেডিওতে , আর ছিল কনক দাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড, এ ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের তেমন প্রচার তখনও ছিলনা ।

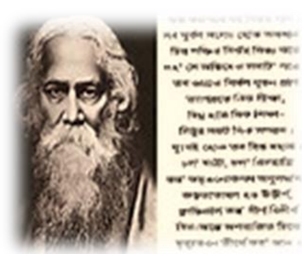

আমাদের ডাঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তিনি সানন্দে স্কুলের প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হলেন । শৈলজারন্জন ও অনাদি বাবু তাঁদের নাম ব্যবহার করতে দিয়ে ও গান শেখাতে রাজি হয়ে আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন । অনেক খুঁজে লেক মার্কেটের কাছে রাসবিহারী এ্যাভিনিউ এর ওপর একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়, তার একতলায় হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান , দোতলাটা হোল গানের স্কুল । তারই ছাদে ম্যারাপ বেঁধে , চমৎকার করে সাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসা করে আমাদের

গীতবিতান স্কুলের উদ্বোধন হয় । সেদিনের তারিখ ছিল ৮/১২/৪১ , সেদিন জাপান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল । আমাদের ফাংশন শেষ করে বাড়ী যাবার পরে রাত্রি দুটোর সময় জাপানের মিত্র বলে ডাঃ কালিদাস নাগ কে গ্রেপ্তার করা হয় ।

এই গীতবিতানই পরে কলকাতার নামি সংগীত শিক্ষায়তন হয়ে দাঁড়ায় অনেক নতুন পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায়, তখন অবশ্য আমরা সরে এসেছি অনেকদিন আর শুভ ও আলাদা হয়ে তার নতুন স্কুল দক্ষিনী গড়ে তুলেছে ।

বিমান আক্রমণ এর মহড়া

সুরু হোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যে কলকাতা রাত্রে আলোর বন্যায় ঝলমল করতো সেইসব আলোতে ঠুলি পরিয়ে কলকাতাকে অন্ধকার করা হোল , বাড়ীগুলোকেও হুকুম হোল যেন বাড়ীর আলো বাইরে না বেরোয় ।

এই সময়ে একদিন সুভাষ বোস হারিয়ে গেলেন , তারপরে রেডিওতে সুভাষ বোসের গলার স্বর শোনা যেতে লাগলো, তা নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা । রোজ কাগজে বেরোতে লাগলো জার্মানি কতটা এগিয়েছে , মিত্রশক্তি কতটা পিছিয়েছে । রাস্তার ধারে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হোল । বিমান আক্রমণ হলে জনসাধারণকে কি কি করতে হবে শেখানোর জন্য গভর্নমেন্ট একটা বিমান আক্রমণের রিহার্স্যালের ব্যবস্থা করলে, জনসাধারণকে কি কি করতে হবে এ নিয়ে কাগজে কাগজে লেখা হতে লাগলো অনেকদিন ধরে, রেডিও মারফৎ প্রচার করা হতে থাকলো । বলা হোতো বিমান আক্রমণ হচ্ছে সেই সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই যেন যিনি যেখানে থাকবেন লুকিয়ে পড়েন, বাড়ীর সকলে একতলার ঘরে জড়ো হবেন, জানলা দরোজা বন্ধ রাখবেন, রাস্তায় যাঁরা থাকবেন তাঁরা রাস্তার পাশের ট্রেঞ্চে ঢুকে যাবেন, ট্রাম বাস থেমে যাবে, যাত্রীরা নেমে ট্রেঞ্চে কিম্বা কোনও বাড়ীতে আশ্রয় নেবেন, ছাদে, বারান্দায় বা খোলা জায়গায় যেন কেউ না থাকে , তার পর শত্রুরা চলে গেছে সেই অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজলে বেরুবেন ।

এইসব শুনতে শুনতে আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল । তারপরে বিমান আক্রমণ এর মহড়ার দিন এল । সবাই এত উৎসাহিত যে মনে হচ্ছিল সেদিন বুঝি কলকাতায় কোনও উৎসব হবে । তার পর যখন বিমান আক্রমণ হচ্ছে বলে সাইরেন বাজলো, তখন দেখা গেল বাড়ীর লোকেদের সকলে মিলে জড়ো হয়ে একতলার ঘরে যাবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ নেই । তাঁরা খোলা জানলায়, খোলা বারান্দায় ও ছাদে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন বোমা পড়া ও প্লেনে প্লেনে যুদ্ধ দেখবেন বলে । অতি উৎসাহীরা রাস্তায় পার্কে বেরিয়ে পড়েছেন, ট্রাম বাস সব থেমে গেল , কিন্তু যাত্রীরা নেমে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন , লুকোবার কোনও লক্ষণই নেই । কলকাতাবাসীর কৌতূহলের কাছে মৃত্যুভয়ও তুচ্ছ ? তারপর যখন সব হয়ে গেল অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজলো –যে যার কাজে চলে গেল—ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল ।

কলকাতার ছাত্রসমাজ

Subhash Chandra with Azad Hind Fau

আমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী তখন ইণ্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন আই এম এস ডাক্তার, বিয়ের পরই ইম্ফলে পোস্টেড হয়ে চলে যান । শুনেছি তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ এসে ইণ্ডিয়ার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, কিন্তু ভারতবাসীরা সেভাবে টের পায়নি। আজাদ হিন্দ ফৌজ হেরে গেলে অনেক অফিসার গ্রেপ্তার হন, দিল্লীর লাল-কেল্লায়, শানওয়াজ, সেগল, ও ধী-লনের বিচার হয় । এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের বিচার করে শাস্তি দেবার ব্যবস্থার প্রতিবাদে কলকাতার ছাত্রসমাজ খুবই বিক্ষোভ দেখায় ।

তাতে বহু মুসলমান ছাত্রও যোগ দেয় , ছাত্রদের বিরাট শোভাযাত্রা রাইটার্স বিল্ডিঙের দিকে যাত্রা করে , ধর্মতলায় পুলিশ তাদের আটকায়, কিন্তু ছাত্ররা যাবেই, ১৪ বছরের ছেলে রামেশ্বর ব্যানার্জি জাতীয় পতাকা নিয়ে যাচ্ছিল , একজন সার্জেন্ট ফ্ল্যাগ ফেলে দিতে বলায় রামেশ্বর অস্বীকার করলে সার্জেন্ট তাকে গুলি করে, রামেশ্বরের দেহ লুটিয়ে পড়ে ধর্মতলার রাস্তায় । কলকাতার অনেক রাস্তার অনেক নতুন নতুন নাম হোল, কিন্তু ধর্মতলার নাম কেন রামেশ্বর সরণী হোলনা জানিনা । যাইহোক তারপর অনেক গোলাগুলি চালিয়ে অনেককে খুন করেও ছাত্রদের সরানো গেলনা। তারা সব রাস্তায় বসে পড়লো । বাংলার গভর্নর কে সি এলেন ছাত্রদের বোঝাতে । তারা জানতে চাইলে কে সি গভর্নর হিসেবে এসেছেন না চ্যান্সেলর হিসাবে এসেছেন ? তিনি বলেন ‘চ্যান্সেলর হিসাবে এসেছি তোমাদের পরামর্শ দিতে’ , ছাত্ররা বসেই রইলো । অনেক রাত্রে শ্যামা-প্রসাদ এসে গভর্নর ও পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করেন পরদিন ছাত্ররা ড্যালহাউসি ঘুরে আসবে শোভাযাত্রা করে । সেটা ১৯৪৫ সালের ২৩শে নভেম্বর, সেই শীতের রাত্রে সারারাত অসংখ্য ছেলে না খেয়ে না ঘুমিয়ে রাস্তায় বসে ছিল । তার পরদিন রামেশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে মস্ত শোভাযাত্রা করে ছাত্ররা কেওড়া-তলায় যায়, দুপুরে বেরিয়ে যেতে যেতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল , সমাজকর্মী জ্যোতর্ম্ময়ী গাঙ্গুলী একটা গাড়ী করে শোভাযাত্রার সঙ্গে যাচ্ছিলেন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও রসা রোডের মোড়ে মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর গাড়ীর অ্যাকসিডেন্টে তিনি মারা যান । আমাদের ষাট বছরের বাবা আমাদের লুকিয়ে রামেশ্বরের শবযাত্রায় যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে যান, এবং অনেক কষ্টে বহু রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারেন । পরে অবশ্য তিন বন্দীই ছাড়া পেয়ে যান, শহরটা একটু শান্ত হয়, যুদ্ধ-তো আগেই থেমে গিয়েছিল , খুব সম্ভব ১৯৪৫ এর মে মাসে । সেই বছরই ৬ই আগস্ট অ্যামেরিকা এ্যাটম বোমা ফেলে হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে ধ্বংস করে, তখনন জাপান সারেন্ডার করে, ও এক লক্ষেরও বেশী অসামরিক লোক নিহত হয় ।

Bharati Mukherjee

Bharati Mukherjee lived in Kolkata, and in USA during her later years. She studied B.A. with Sanskrit honors in Ashutosh College Calcutta (1938-40).

উপসংহার (Compiled by Pradipta Chatterji)

এই রচনাটি কয়েক বছর আগে অঞ্জলিতে প্রকাশ করা হয়েছিল । পুরনো দিনের বাঙালি সমাজ ও ইতিহাসের কিছু মূল্যবান তথ্য এখানে থাকার জন্য নতুন পাঠকদের ভাল লাগার আশায় লেখাটি আবার পুনর্মুদ্রিত করা হোল ।

অনেক অনেক ছোট ছোট ঘটনার বিবরণে মায়ের ডায়েরি সমৃদ্ধ । আজকের বিশ্বায়নের যুগে এসব ঘটনা গল্প-কথা হয়ে গেছে । সেই কোন ১৯৪৭ সালে পাওয়া স্বাধীনতা আমাদের কাছে এখন খুবই পুরানো, আমরা ভুলে গিয়েছি বহু মানুষের আত্মত্যাগ । এত কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতার যথাযথ মর্যাদাও বর্তমান সমাজ দিতে পারেনা; অনেক অন্যায় ও দুর্নীতির কোনও প্রতিকার হয়না আজকের স্বাধীন ভারতে । এখনকার তরুণের মনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধহয় আর তেমন ভাবে আলোড়ন তোলে না । হয়তো এটাই স্বাভাবিক, এইভাবেই ঘটে সামাজিক বিবর্তন বা একেই মনে হয় বলা যেতে পারে *কালের যাত্রা* , রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ।

তবে আপাতদৃষ্টিতে মূল্যহীন বলে মনে হলেও এইসব ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে আছে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক ইতিহাস । ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে বর্তমান সমাজ, আর আজকের সমাজের মনে হয় অনেক কিছু শেখবার আছে তার এই সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে তাই এই অতীত রোমন্থন আজকের দিনে বোধহয় সম্পূর্ণ অর্থহীন নয় ।

Footnotes:

Acharya Sir Prafulla Chandra Ray CIE (Bengali: প্রফুল্ল চন্দ্র রায়; 2 August 1861 – 16 June 1944)[1] was a Bengali chemist, educator and entrepreneur. The Royal Society of Chemistry honored his life and work with the first ever Chemical Landmark Plaque outside Europe. He was the founder of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals, India's first pharmaceutical company. He is the author of A History of Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Middle of Sixteenth Century (1902).

Bowbazar (also spelt Boubazar) (Bengali: বৌবাজার) is a neighbourhood in central Kolkata (formerly known as Calcutta), in the Indian state of West Bengal. The neighbourhood has been at the forefront of Kolkata's changing society.

Bowbazar.(Bazar) is said to have been part of the share of a daughter-in-law of Biswanath Matilal, but some historians have failed to trace or identify that person.

Khulna is an old river port located on the Rupsha River. It is an important hub of Bangladeshi industry and hosts many national companies.

Debabrata Biswas (also known as George Biswas and George-da; 22 August 1911 – 18 August 1980), was an Indian Rabindra Sangeet singer.

Dharmatala (Bengali: ধর্ম্মতলা) is a neighbourhood in central Kolkata, earlier known as Calcutta, in the Indian state of West Bengal. Dharmatala Street has been renamed Lenin Sarani but the neighbourhood continues to be referred to as Dharmatala. It is a busy commercial area that had come up with the growth of Calcutta during the British Raj and is thus one of the repositories of history in the city.

Gurusaday Dutt (Bengali: গুরুসদয় দত্ত 1882–1941)[2] was a civil servant, folklorist, and writer. He was the founder of the Bratachari Movement in the 1930s.

The Indian National Army (INA; Azad Hind Fauj) (Lit: Free-Indian Army) was an armed force formed by Indian nationalists in 1942 in Southeast Asia during World War II. Its aim was to secure Indian independence from British rule. It formed an alliance with Imperial Japan in the latter's campaign in the Southeast Asian theatre of WWII.[1] The army was first formed in 1942 under Mohan Singh, by Indian PoWs of the British-Indian Army captured by Japan in the Malayan campaign and at Singapore

Pankaj Mullick, Anadi Ghosh Dastidar were eminent singers of Bengal and, Dwijen Mukhopadhyay received his training in music from them.

Rajendra Prasad was the first President of the Republic of India. An Indian political leader, lawyer by training, Prasad joined the Indian National Congress during the Indian independence movement and became a major leader

from the region of Bihar. A supporter of Mahatma Gandhi, Prasad was imprisoned by British authorities during the Salt Satyagraha of 1931 and the Quit India movement of 1942.

Suvo Guha Thakurta was a devotee of Rabindrasangeet. He wanted to spread it among Bengali masses which was then confined primarily to Santiniketan. On the advice of Shailaranjan Majumdar, he founded Dakshinee on 8 May 1948.

Swami Pranavananda (Bengali: স্বামী প্রণবানন্দ) also known as Yugacharya Srimat Swami Pranavananda Ji Maharaj, (29 January 1896 – 8 February 1941)[1] was the founder of the organization known as the Bharat Sevashram Sangha.

Womesh Chunder Bonnerjee (or Umesh Chandra Banerjee by current English orthography of Bengali names) (29 December 1844 – 21 July 1906) was an Indian barrister and was the first president of Indian National Congress. He was the first Indian to contest the election for the British House of Commons although he lost the election.

www.wikipedia.org

Pandemic did not affect mother nature's bounty

Photography by Sheema Roychowdhury

Sheema Roychowdhury

Educated in India & USA. Recently retired from Specialty Chemical Industry. Loves flowers and gardening

Dream Town

Acrylic on board

Rajarshi Chattopadhyay

.

A disciple of the Government College of Art and Craft, Kolkata in 1996. his works developed into figurative and contemporary thoughts with the taste of fantasy.

His medium fits perfectly with his creation., he plays with black with colorful overtone. The rift between society and globalization is evident in his works.

Alpana by Vaswati Biswas

Vaswati Biswas was a longtime resident of upstate New York, she had recently moved to Charlotte, North Carolina with her family. She loves reading, writing, and nature.

"Alpona is a traditional art evolved from a folk one in Bengal. This art is a style of decorating and designing the floor with beautiful designs. In Bengal Alpona is drawn or painted with white liquid comprised of rice powder and water during auspicious occasions like festivities, celebrations or ceremonies. However, nowadays the medium of paintings have been replaced by chalk and paints and other mediums.

Seasons

Paintings by Amrita Banerjee

Amrita Banerjee is from Kolkata, she uses watercolor and oil for her paintings.

Durga Puja

Paintings by Pradipta Chatterji

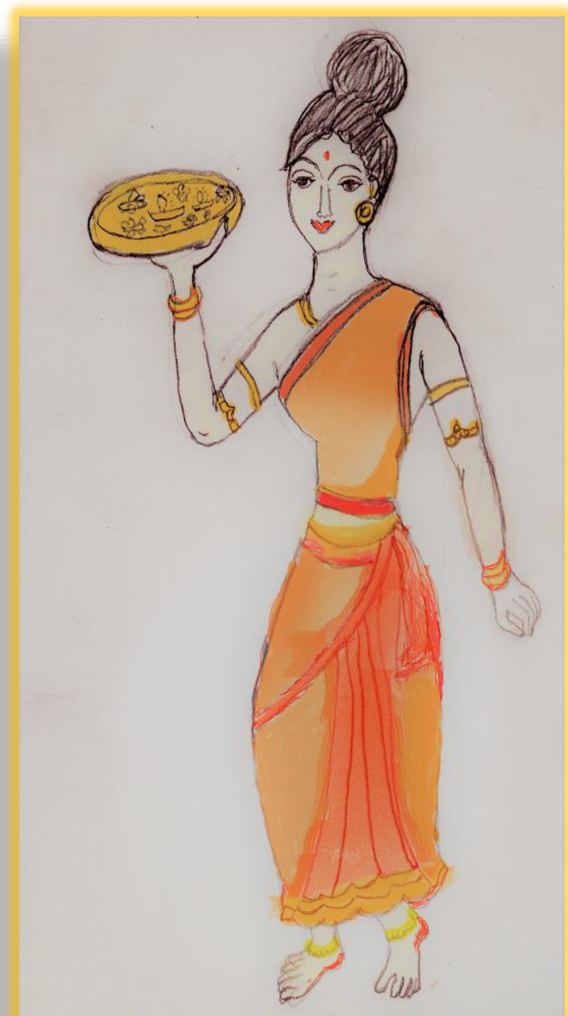

Pradipta Chatterji is a longtime resident of Vestal, a small town in Upstate Newyork. She has recently retired from her job (35+years) in the New York State's Office of Mental Health.

Presently she's trying to draw and paint a bit, which was her passion in her childhood & adolescent years. She's also interested in persuing digital drawing and painting.

Every night i stand alone

Paramartha bandyopadhyay

Every night I stand alone
On the tangent of the four crossing roads,
Next to my door,
Every night I stand all alone there,
When the neighbourhood fall asleep,
When the stars tired of blinking,
When the stray dogs are looking for shelter,
And when the night resting on its wings.
I go there bare footed
Where those four roads are eagerly awaiting me.
I do stand on the tangent,
The four-start moving.
They have waited the long whole day for me.
I don't know if the road from east is moving to west or it's vice versa.
I don't know if the road from north is moving to south or it's vice versa.
But I feel beneath my feet,
they are moving.
When the earth is sleeping,
When there's nothing to move on them,
When there's nobody to hurt their soul,
They start moving by themselves.
Standing on the tangent
I do start moving with them too.
We don't know the direction,
We don't know even the destination,
We just embrace the loneliness with our hearts & souls.
We stand all alone in the dead night,
We stand all alone.

Paramartha Bandyopadhyay is from Kolkata, India and service is his profession. His passion is to write poems, stories, and articles.

Headgear

Arnab Dasgupta

It is a Saturday evening of summer 2031 in Binghamton, New York. Rick, the 10-year-old boy of an Indian Bengali family, was looking for an opportunity to speak to his Dad. Once his dad finished listening to the news and about to climb up the stairs to avoid getting the next assignment from Mom, Rick stood in front of him.

- How are you Dad?
- What?

Dad was pleased obviously to see his little boy asking him "how are you" but did not show.

- Why?
- No – I thought you will take that medication – Kal… whatever…
- Kalmegh – it is an herbal medicine – yes, I will take that soon – why?
- I was just wondering – you said it is bitter – like how bitter?
- Why don't you take a spoon and taste for yourself? It won't harm you. Good for you.
- No no… Rick seemed worried… it might have some side effect!
- No side effect – it is herbal – come I will give you.
- No no… I have a better way to taste it – just put this headgear on while taking the medication and I will have the other one. So when you taste I will get it.
- Oh… yeah… that's a marvel of science. I really enjoyed your aunt's paneer tikka masala other day when she cooked that in Kolkata. So you put your head gear on, I put mine. Can it record the feelings and send later?
- No – Dad, recording the signals now and sending them later might be possible in the future. At this time signal generation and transmission happens at the same time. Once recording the feelings, saving and sending later is possible, auntie will stop cooking! You go upstairs. When I tell you "now" – you take the medication.

Dad did not have any idea what is going on and thought it is an honest curiosity of his ten-year-old. He, with his affectionate eyes, could not see through into the vicious revengeful monstrous plan his ten-year-old made!!!!

Rick gave one headgear to Dad, the other one he put on his own head and then connected them to Lili's headgear back in India whom she already instructed to put hers on for a "Big Surprise"!! Rick adjusted his headgear a little above his head to make the upcoming taste signals a bit less intense and said aloud "Now".

Dad took the medication and Lili, on the other side of planet, got a terribly bitter taste of the Kalmegh – the Indian herbal. Rick was prepared with his headgear not so well connected but Lili was not and did not like the surprise at all. She screamed at the top of her voice – "Dada, I will kill you".
"Ha ha ha…," Rick laughed. "Now you know… whom you messed with".

Rick wanted to punish his cousin sister Lili living in Kolkata, India. It was a very good healthy brother-sister relationship, but a recent event damaged it pretty badly. Rick wanted to taste his aunt Lili's Ma's chicken recipe. Auntie in Kolkata makes it so good. Rick was ready to use his headgear when Lili will eat and transmit the taste straight over to Rick – but Lili, without any prior intimation to Rick, mixed that with red hot chili that she liked but Rick did not. Rick begins sweating if food is hot with chili. Lili added too much chili into the chicken that Rick waited a month for!! When Lili ate, as usual Rick had his headgear on to enjoy the taste and the result was no good. The hot chicken taste blasted Rick's brain through the headgear. Rick had to remove his headgear immediately and run to washroom. How dare Lili decide to change the taste of Rick's favorite dish without his knowledge – that he waited for over a month?

Here goes Rick's bitter revenge!! You give me hot chili, I give you bitter herbal – your body will not get the benefit but good for your mind – will make you so happy!!

An uproar went over on both families. Lili's Mom had to assure Rick she will make his favorite chicken again the next day and it will be Auntie who will have the headgear on during dinner so Rick can enjoy it during his lunch and Lili will get no chance to make any changes! Rick's father decided he will never put that headgear on together with Rick and actually will not trust Rick without learning if there are evil intentions. At the end Dad, Mom and Auntie back in Kolkata had a good laugh over the mischief of the tech savvy kids. They were happy because the headgear is a solution to the problem "food cannot be emailed".

Are you a reader from the past? Not familiar with the taste headgear technology? Are you from the year 2021 when our 10-year-old Rick was born?

Well – then let me explain.

A taste headgear is a recent invention. You can get the taste of anything without actually taking the food in your mouth from anywhere using them. All you need is someone has to taste the food by actually eating the food with a headgear on, which is connected to the headgear you have on your head. Distance between the two persons or the two headgears does not matter. One can be on earth and the other could be in outer space if proper connections are there between the two headgears. The result is whatever one person is feeling, that can be taste of good food or some pain in the body, the other person will get the same exact feeling. This happens because every sense is sent to brain in the form of a signal. Brain interprets the signals and we get the feeling. Headgear can read such signals and transmit to other headgears connected to it. Same signals thus reach the brains of persons wearing connected headgears and they get the same feeling. Therefore, as the signal originator is enjoying a good dish, such as chicken made by Rick's auntie, the other will enjoy the taste too. [1] It is all with brain signals. Food taste, happiness, sadness, anxiety, elation everything relates to some brain signals and technology has evolved to accurately capture the signals and transmit them to another headgear at any other place on planet earth and beyond – provided there is enough bandwidth to receive the signal.

Now… let us come back to reality… 2021!!

Gadgets such as Rick's headgear will work at the Brain Computer interface and might look like the Electroencephalographic (EEG) headset and Kernel's headgear shown here [1,2]. EEG headsets can read brain signals to judge if a student is awake enough in the classroom or not being attentive and let the teacher know. Signals will be sent from the student wearing the headset to the computer teacher has in front of him. Kernel's headgear can have a better analysis based on reading much more signals at the same time and tell you if your brain is ready to watch a thriller or tired and should listen to some soothing music. It will take several more years to transmit brain signals, such as food taste, from one headset to another. Let us look forward to that because in US, we miss so much of Indian food, especially the street foods. Furthermore, how good it will be to get the taste of all food and not having it actually – so you do not need to have a diet control!! A diabetic patient can taste as much sweet without raising his blood sugar level. A health-conscious person can try street foods from cities in India without worrying about the hygiene! Let us look forward to that and thank those scientists who are working hard to make that happen!!

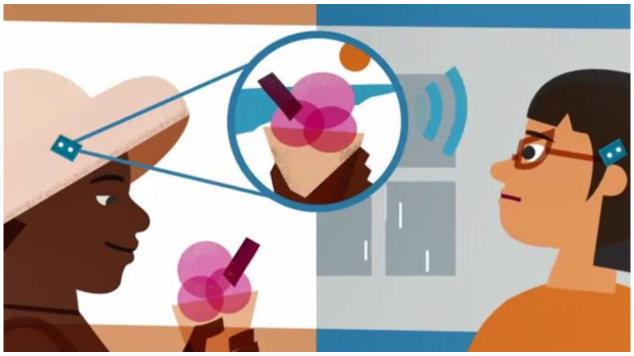

Tasting and sending the signals to a receiver faraway. [1]

Electroencephalographic (EEG) headset with 14 detectors currently available. [2]

Kernel's Full lasers, 312 covers all the brain and size of heads.

Headgear with 52 detectors that key areas of the flexible to fit all [3]

Links:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=K8uijjp6hfc
[2] https://www.emotiv.com/epoc/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=RswhkU4eaVA

Arnab lives with his wife Dipa and son Arpan in New Hartford, NY. Even after spending 33 years outside West Bengal, Arnab is a Bengalee at heart and loves to read, travel, sing along with karaoke tracks and write poems and short stories. A staunch follower of Swami Vivekananda's philosophy, Arnab dreams of a society free of tensions coming from differences in faith and religion.

Unique culture of south-Gullah Geechee

Vaswati Biswas

Gullah Quilt

I first came across Gullah Geechee culture when I visited Boone Plantation in Charleston, SC few years back. Who are the Gullah Geechee?

Gullah- Geechee are African Americans of Sea Islands and coastal plantations in the South. They are the descendants of West and Central Africa, more precisely Sierra Leone and Angola and developed ethnic tradition which is unique in America.

They were enslaved and brought to the southern part of US, mainly in North Carolina, South Carolina, Georgia and Florida. Their great expertise in rice cultivation in Africa was the prime reason chosen to bring here to help the settlers who were unaware of it. Since these enslaved people worked mostly in the sea barrier islands in isolation, they were able to retain many of their African traditions. These traditions reflected in their food, arts and crafts, music and spiritual traditions. They developed a creole dialect of English called Gullah which also refer distinctive ethnic identity as a people. Gullah has become the accepted name of the islanders in South Carolina, while the Geechee refers to the islanders of Georgia.

In Western Africa coast, the local people had cultivated African rice, which is very distinct from Asian rice. Once the British settlers of the South discovered that African rice would grow in the hot humid southern US coasts, they sought western Africans and enslaved them and brought here, because they had the skills and knowledge of the rice farming. By the mid- 18th century, the low country of Georgia and South Carolina and Sea islands were developed as African rice fields, cotton and indigo plantations. Often during spring and summer, these plantations were encroached by mosquitoes, and tropical diseases like malaria and yellow fever manifested there. The swamps and inundated rice fields of the low country picked up the diseases to European settlers and became endemic in the region.The settlers left the plantation during the rainy spring and hot summers to African overseers as they were more resistant to the diseases. This prolonged geographical isolation, climate and cultural pride helped the Gullah people to preserve much of their African cultural heritage and developed the distinct creole language Gullah.

Gullah- Geechee continued their traditional culture with little influence from the outside world well into the 20th century. Their cuisine is a fusion of West and Central African cooking techniques with Low-country ingredients.They have preserved many of their West African food such as Sea Islands red peas, Carolina gold rice, sorghum and water melon.

Rice is their staple food and there are strict rituals surrounding

The preparation of rice in Gullah communities. They loved to cook rice dishes called Red rice, Crab rice and Okra soup. Today there are several restaurants in south serving Gullah cuisine.

Sweet grass basket making is an ancient African art, passed down and preserved by generations of Gullah-Geechee. The baskets aren’t made with typical weaving techniques like plaiting or twisting but Gullah artists employ the West African

tradition of coiling. They were largely weaved as a tool for rice production, but now commonly marketed as decoration pieces to tourists. Because of this practice and rich

history, a seven mile stretch Highway 17 near Mount Pleasant, South Carolina has officially been designated as the “Sweetgrass basket Makers Highway”.

Gullah Geechee incorporated Christian influences into their African system beliefs

during and after enslavement. Praise houses, structures were built where they could meet for religious worship. Religious meetings were the spiritual outlets for enslaved Africans on

the Sea Islands. Such spiritual elements played a role where ancestral bonds, community experiences, healthy respect for elders and nature continued and created a unique Gullah Geechee tradition. Praise houses were small frame houses often an elder slave cabin on the the plantation.

Ring Shout was one of the Gullah religious ceremonies that stemmed from African tradition. While Gullah people were converted to Christianity by their masters, they kept true to their celebratory African style. Ring shout represents a style of dance and music by enslaved communities on plantations. The dancers or shouters move in a counterclockwise circle shuffling their skirts, providing rhythm by clapping hands and tapping feet. One or two singers would set the tempo by singing and another individual would rhythmically beat the floor with wooden stick. The ring shout provided the suffering enslaved people unification and cultural fortification. Today the McIntosh County Shouters and Geechee Gullah Ring Shouters are two organizations preserving the culture.

Gullah Geechee are one of the oldest cultural groups from late 16th century and thriving as a “nation within a nation” today. Even after emancipation of slaves, Gullah Geechee community stayed isolated in the coastal region of Atlantic Ocean. They never forgot one thing- their unique heritage. Because of their historical isolated locations and strong sense of identity they

Gullah Geechee Corridor

have preserved more of their African cultural heritage than any other group of African Americans. Recently in 2006, the

Congress identified the Gullah Geechee National Heritage corridor to increase awareness of this unique culture and preserve it.

Vaswati Biswas was a longtime resident of upstate New York, she had recently moved to Charlotte, North Carolina with her family. She loves reading, writing, and nature.

Alzheimer's Disease, its Progression, and Photographs

Archana Susarla

Dementia is a chronic and persistent mental disorder caused by brain disease or injury and is marked by memory disorders, personality changes, and impaired reasoning. There are six types of Dementia-Alzheimer's Disease (AD), Frontotemporal Dementia, Alcohol-related Dementia, Lewy-Body Dementia (DLB), Mixed Dementia, and Vascular Dementia. I have worked with patients diagnosed with AD from 2014-2020 in day programs. AD is a type of dementia that slowly destroys memory and thinking skills, eventually damaging a person's ability to perform daily tasks. Alzheimer's disease may last a decade in some patients and early on-set can begin as early as forty. Patients with late on-set Alzheimer's develop symptoms in their sixties.

I. Pre-clinical Stage-The pre-clinical stage of AD shows in clinical settings and begins long before clients display any symptoms. Proteins such as amyloid beta (plaques discovered in the brain of patients diagnosed with AD) are discovered in this stage which is a key to diagnosing AD (Mayoclinic, 2021).

II. Mild Cognitive Impairment (MCI)- Patients with Mild Cognitive impairment (MCI) display mild changes in memory such as not being able to remember recent conversations or recent events. Patients may not be able to budget the amount of time needed or remember the steps required to complete tasks. During the MCI stage, patients begin having difficulty making decisions (Mayoclinic, 2021).

III. Mild Dementia due to AD- Diagnosis of AD usually takes place during the mild stage of AD, when daily functioning starts getting affected. During the mild stage, patients may show memory loss of recent events such as newly learned information and begin asking the same question repeatedly. In addition, they develop problem solving difficulties, have trouble completing complicated tasks such as balancing a checkbook, and making judgments such as financial decisions. The personalities of patients may change in that those patients with a gentle temperament may become withdrawn and patients with an aggressive temperament become easily angered. The patient's motivation to complete certain tasks may also decrease. During the mild dementia phase, patients may have difficulties with word finding and recognizing familiar places such as their neighborhood (Mayoclinic, 2021).

IV. Moderate Dementia due to AD- Patients diagnosed with moderate AD become more confused and need more help with self-care. Clients with moderate AD forget where they are, the day of the week, and may confuse family members. Some patients may wander in unsafe places, forget their phone numbers, schools they attended, and become repetitious. Patients in the moderate stage may need help with toileting, grooming, and bathing (Mayoclinic, 2021).

During the moderate stage of AD, clients personalities tend to change where patients with gentle temperaments become more withdrawn and lethargic and patients with aggressive temperaments are angered easily (Mayoclinic, 2021).

V. Severe Dementia due to AD- As patients develop severe dementia, the mental function and mobility of the patients severely deteriorates. Patients with severe dementia cannot make sensible

conversation and need complete assistance with personal care. Patients diagnosed with severe dementia are unable to walk with-out assistive devices such as a walker or cane, hold their head up, have rigid muscles, and abnormal reflexes (Mayoclinic, 2021).

As patient's abilities to perform certain functions such as personal care independently decreases, they are sent to nursing homes where patients who are able to perform some tasks independently or with some assistance attend day programs with a structured environment.

VI. Risk Factors for Developing AD- Certain people are at a higher risk for developing AD. The biggest risk for developing AD is age. Decline in cognitive function increases as people live longer. People whose parents have AD are also at a higher risk for developing AD. Patients who have been diagnosed with health problems such as strokes, diabetes, depression, head injury, and hypothyroidism (low thyroid) are also at a higher risk for developing AD.

Healthy lifestyles activities such as decreased stress, proper nutrition, and avoiding diabetes can decrease the risk of developing AD. The 2 basic types of AD patients develop are familial and sporadic. Familial AD is a form of early onset AD which is passed on by generation. Sporadic AD does not have a cause and can be related to genetic factors (Risk Factors, 2021).

VII. Personal Experience with AD- I have worked with patients diagnosed with mild AD in day programs and seen them perform many tasks with some assistance. I have had the opportunity to play games such as marbles with them and seen them remember and recognize basic colors such as red, blue, green, orange, and yellow as well as the different sizes of the marbles. I have played dominos with them and seen them recognize squares and rectangles as well as the numbers from one through six on the dominos. Clients are able to keep score up to ten- thousand, even though they need some assistance. Although patients need some help, they are able to follow the turn-taking rules of the game and remember the order in which their turn comes. I have also played simple card games such as UNO with patients diagnosed with mild AD and seen them match either the colors or the numbers with minimum assistance. Patients with mild AD are able to follow simple recipes and such as making salads. While working with patients with AD, I have seen them recognize and follow safety procedures for cutting using a knife. Clients are able to recognize and cut, fruits such as apples, bananas, pears and oranges, and vegetables such as carrots, onions, squash, lettuce, cabbage, and tomatoes and be able to remember the bowl they need to place them in. In addition, clients diagnosed with mild AD are still able to remember their birthday and enjoy different festivals. During my time working for the Office for Aging, I watched clients diagnosed with mild AD enjoy summer picnics such as the fourth of July festival as well as the annual holiday party done by the Office for Aging. Clients are able to recognize certain meals they like as well as different ways of making them. Working with patients diagnosed with mild AD was a rewarding and enjoyable experience.

VIII. Walk to End Alzheimer's Disease- I have been doing the Walk to End Alzheimer's Disease since 2014 and have seen patients diagnosed with AD walk with assistance devices such as single and four-pronged canes, and walkers. Clients also participate in the walk using manual and motorized-wheel chairs as well as holding a family member's hand. Clients diagnosed with Mild AD are also able to

recognize the displays on the tables such as t-shirts, pens, pencils, hooded jackets, banners, cups, glasses, mugs, and bags, as well as keep conversation when not walking.

Clients diagnosed with Mild Alzheimer's Disease are able to perform many activities with some assistance that they were able to before diagnosis and it is rewarding to see what they can accomplish.

Photographs of the different phases of AD

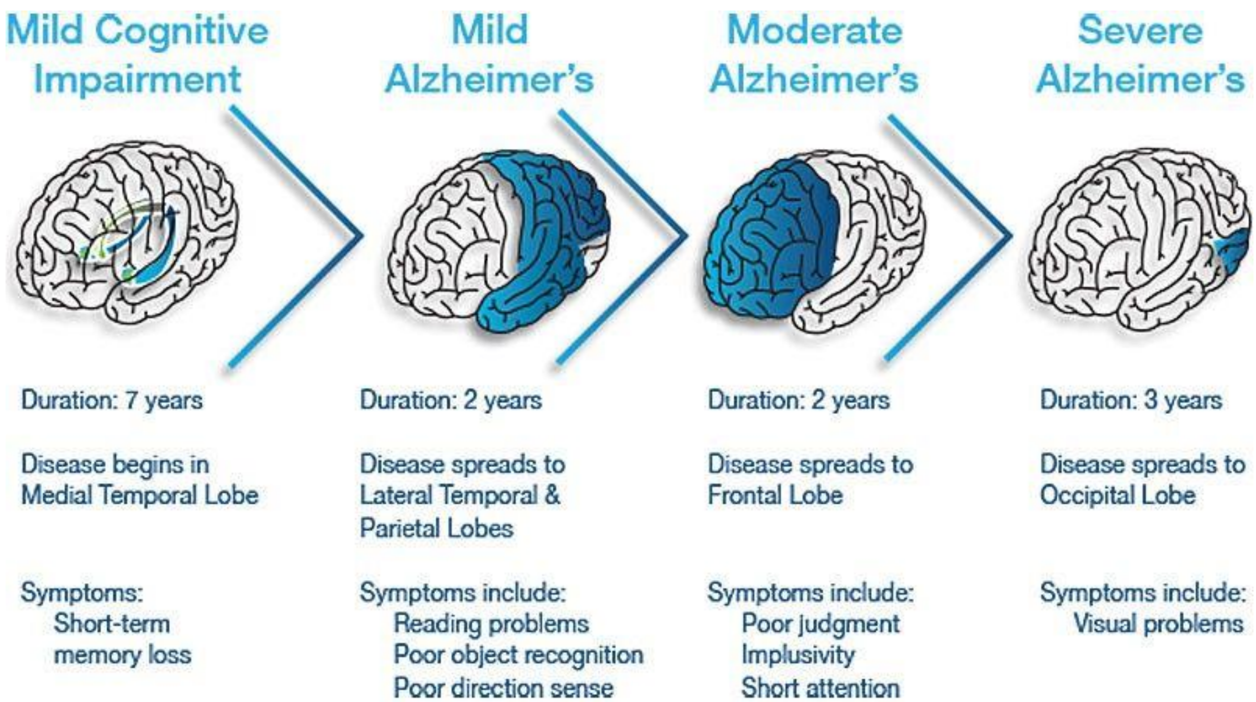

Reference

Alzheimer's Stages: How the Disease Progresses. (2021). Retrieved June 16, 2021 from mayo foundation for medical education and research (MFMER).

Alzheimer's Risk Factors. (2021). Retrieved June 21, 2021 from https: //alzheimersprevention.org-alzheimers-info/risk-factors/.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She works with Alzheimer's patients engaging them with social activity and memory stimulation.

Foundation stones

Sushma Madduri

And they lived happily ever after…

A huge pink heart with these words on it behind a decorated car! I hope you all can easily relate to this typical scene at the happy ending of an 80s Indian rom-com filmy drama. One of the buzurgs (respectable older folks) bless the newlyweds with tears in their eyes and a standard asheerwaad (blessing) of, “ may you both build your bond with mutual trust and respect”.

In addition to that- the couple will be notified by several mausas and mausis, chachaa + chaachis, other aas paas ke rishtedaar to keep the vows, take care of each other, and stress on the need to occasionally express feelings of consistent love and affection at every possible opportunity!

But the most important and yet exciting part of any wedding are the lots and lots of gifts/presents from friends and family. Some of these are intended to aid the newlyweds on starting their journey together, while others serve as a memory of the milestone in their lives. I don’t know about the current trend, but hamare zamane main- there is no wishing list – ‘jo bhi milaa – bas rakhlo policy! I prefer the ‘wishing list’ for a ‘wedding registry’ or a baby shower registry in the West. Can cut short some of the not so much needed gifts and purchases. I also like the friends who give you cash- you can buy what you want! That is much easier.

Anyways- coming back to our ‘naya ghar ke saamaan’ list... some of these gifts tend to become the ‘foundation stones’ of a successful ‘ghar-sansaar’!

Of them include a Sumeet grinder and mixer, a Philips iron-box, a tawa for ‘burning’ rotis (what do you expect from a new bride?), a name plate (to go on the door) with Mr. and Mrs. Surname, a filmi style tea set, a wall clock, a few tumblers and plates, and so on. I won’t include the godrej almirah, fevicol ki mazboot jod se banaye gaye various furniture and all, because they usually don’t come as gifts. However, they do somewhat belong to the ‘foundation stones’ list.

Some of these samaan tend to be used on a regular basis and will be religiously serviced from time to time, and the others will be carefully stowed away either in the attic, or a closet for occasional use or a future gift to someone else. The tea set, I bet will be stored in its original packing. The steel samaan used in the kitchen will have the shriman’s name inscribed on it- constantly reminding the couple of the person who gifted them. A great way to say thanks to grace!

Coming to the actual story- if any one of the foundation stones goes wrong- life comes to a complete stall! Ahem ahem… something similar happened yesterday in my sansaar!

My darling shrimaan decided to help himself (and me) by ironing his own clothes for the day (as a service rendebred towards ‘Women’s Day’ celebrations). Behind the screen kahaani is : there is a technical workshop in his office tomorrow- and I could not get his clothes ready due to a hectic week I had at work (SShhhh.. please don’t mention this to him). I have decided to accept the ‘Women’s day’ clause and am planning to demand such services in the future 😊

Have you read the book- “Men are from Mars and Women are from Venus”? If not- please do!

Some of my friends sincerely followed my advice and embarked on reading and completing the book in a single sitting. They came back and commented: “I thought I will completely and successfully understand my spouse’s behavior after reading the book- but not really. The confusion only got bigger!”.

Well, when did I say or guarantee that bhai? I stated a fact that can be somewhat understood! The duo behaviors are going to be different for sure. And this is something not to be worried about. To expect them to be the same is asking for big trouble! I was convinced with that conclusion and made peace with the differences.

Coming back to the iron-box episode... shrimaan plugged in the appliance into the socket and started the professional style istree. I have the box on my right (being right-handed obviously) and the cloth in my front. I usually plug in the socket also towards the right- so that the cable/wire does not come in the way of the job. Lekin- men aaaaaaa……re from mars...! The frame was exactly opposite. Box on the right, plug on the left, wire dangling in the center, confidence hanging in the air, and sholay on the television as a background score.

Gabbar : “ Are oh Samba- sarkaar ne mere oopar kitne daam lagaye re?”

Samba: pacchas hajaar sarkaar!

Gabbar: sunaa tumne? Poore pacchaas hajaar!

……………….

Eyes on the television, wire dangling here with a big thud... istree dabba on the floor!

No burns! Everyone safety was first ensured. And then a glance exchange happened. Not between gabbar and kaliya, but myself and shrimaan! 14-year-old istree dabba- aka one of my foundation stone just became Shaheed! I stood up silently and saluted with utmost devotion to the service rendered by the little steel box. We tried turning it on after a nominal CPR- inspite of the unexpected bungee jump it made and the original sound track heard, but Shaheed hain to Shaheed! No looking back!

One of my dearest ‘foundation stones’ has made its way to grace!

All my trips back home usually have some of my other foundation stones packed in my suitcases for their regular service. Arey- the concept of ‘service’ and ‘re-use’ is not heard of here in the West! Sirf ‘Use and throw’. No surprise- there is so much plastic and junk that gets piled up in the Oceans! Why are we making so much? And then dump them? Why can’t we re-use them? After all a machine is supposed to have a decent lifetime! Itne saare engineers and no real ‘engineering’!

I regularly get my Sumeet mixer serviced at the same old service center. The bhayya there remembers me so well. He handed me several spare parts for the unit and promised me to teach me ‘live’ on a zoom call- in case I find it hard to change the rubber bush/valve or the motor parts in case of a repair. See-? That is what I called ‘loyal service’- a true namak-halal!

Prestige pressure cooker bhi—so many years and yet perfect condition! Just keep changing the safety valves and wisely use the gasket- it should last for a while! Agar handle breaks- to bhi you can use it as a spare for your batter, or a stove-top oven for your cake!

My dosa pan and the ladle used for it is another super-jodi! I happen to drop the ladle into a small gap between my counter-top and fridge. That is the hardest place to reach! I used a wire-hanger to carefully pull it out- otherwise no dosa for the day!

And guess what else I pulled out that day? A couple more ladles (that were thought to be lost in garbage by mistake) and a half-decomposed mouse! Now I know where that stink came from all those nights! And Why prabhaa (my doggy) continued to sniff around the fridge all that while. Dogs are made for the job- and I should have paid attention! Huh!

I do not want to forget mentioning the name plate we got as our other foundation stone. It hangs regally outside my front door on my porch! Seven generations of spiders have/are living behind the untouched wooden board. I wanted to re-paint it several times- but stepped back from that thought as it could render the spider ghar pariwaar homeless!

Well- I am sure all of you have such precious and priceless foundation stones at home. Enjoy them while they last!!

Sushma Vijayakrishna

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart. I strongly believe that our very being is always influenced and improved by observing two important facts of life: Mother Nature and People!

Amazing Alaska

Asish Mukherjee

It was 11.15 on a beautiful August night when we stepped out of Anchorage airport and hailed a cab. Our motley group consisted of two preteen children, their young parents Moon and Jit, and me and my wife Su who were older. We enjoy travelling together and had felt that a trip to remote Alaska would be a welcome break to our COVID-ruled daily lives.

Aishani, the 10-year-old youngest member of our group blurted out in surprise, “I thought we were going to the Arctic area, this is no different from Michigan!”

Truly, we had expected Alaska to be a wilderness where Eskimos live in igloos and wear animal hides to fight the bitter cold. Anchorage seemed no different from any mainstream American City as the taxi sped down a four-lane highway. The air was pristine, and the sky was sprinkled with stars. In the distance we could see silhouettes of rolling mountains that rose above the horizon and seemed to cradle this pretty valley.

Soon we were in downtown. The roads were dotted with restaurants, stores and hotels. Familiar names like Marriott, McDonalds, and Dunkin Donuts were all around. We arrived at our destination Anchorage-Hilton and were shocked to see at least 20 persons, mostly airlines staff standing in a long line to check in. There was only one desk open. It was obvious that the evils of staff shortage have not spared this Shangri La. All on a sudden our phones sounded alerts and we were pleasantly surprised to see that the hotel app had activated electronic keys for our rooms. Thanking modern science after all, we took the elevator and hit our beds.

As the first rays of the morning sun trickled through the curtains, I ran to the window. The still glassy surface of the bay lay still in the soft light of dawn, fringed by long mountain ranges. We soon finished our breakfast and headed towards the famous coastal trail.

Coastal Trail, Anchorage

It took a fair amount of walking before we reached the starting point of the trail.

Aarit at 12 years age was the most energetic of the group. He was seething to start on this scenic hike.

“Uncle”, Aarit asked with a knowledgeable smile “have you heard of Anthony Knowles?”

“No dear”, I had to admit ignorance.

“He was the seventh governor of Alaska. And this trail is named after him”

The Tony Knowles Coastal Trail follows the shore from downtown Anchorage to Kincaid Park. Running along coastal marshes, over forested hills, and passing one of the most dramatically altered landscapes of Anchorage – the Earthquake Park., the trail is perfect for biking, walking, and even wildlife viewing.

Our starting point was marked with a sign “0 Mile, total length 11 miles, much to the chagrin of my wife Su who best enjoys her vacations, curled up in a hammock. The trail was a vantage point for great views of Mount Susitna, also known as Sleeping Lady. It was a clear, balmy autumn day with temperature in mid 50s, and we could see the snow-covered Denali loom on the horizon. As we trudged along, we started appreciating the benches along the way, but unfortunately, the only bathroom facilities were in the wild.

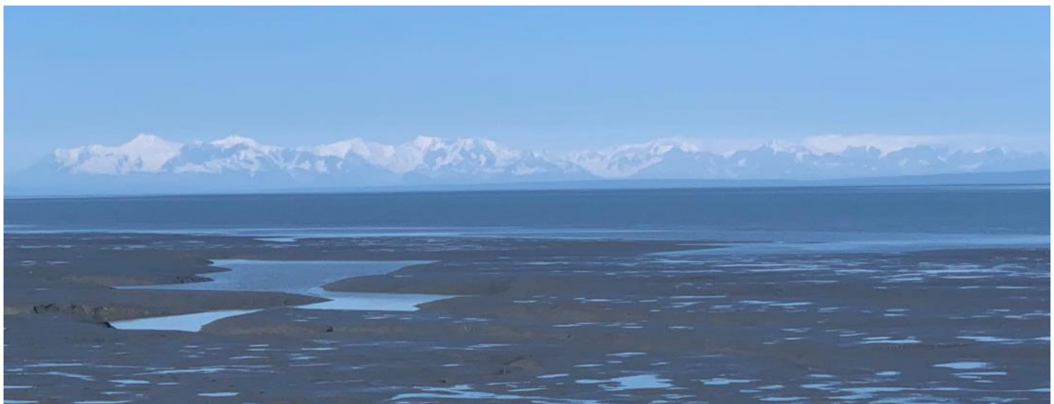

Denali Across the Bay

After 6 miles, we reached the site of the worst damage from the 1964 earthquake. This point is known as Earthquake Park. It was already past noon, and we decided to call for a cab to return to our hotel.

Simon and Seafort

Dinner that evening was at the famed seafood restaurant – Simon and Seaforts. We had no trouble finding our way on foot, as the downtown area was set in a grid with rational numbering. The service and ambience at the restaurant were exceptional and their Halibut dishes were out of the world!

For the next day we had booked a global private tour service called “Tours by Locals”. This way we planned to dodge the dreaded virus and enjoy a customized trip. Jason was a very pleasant and energetic driver. He took us in his comfortable Ford Expedition down Seward Highway. This 127-mile-long highway is highly esteemed for its scenic, natural, historical, and recreational values. The first 50 miles stretch southeast from Anchorage

skirting the base of the Chugach Mountains and the shore of Turnagain Arm. In about an hour, we reached a rocky promontory called Beluga Point where it's common to sight beluga whales.

Aishani, our youngest traveler was quick to ask, “Uncle, what is Beluga?

Aarit, an avid reader lost no time in scoring over his younger sister.

“Beluga refers to a type of whale which are relatively small, often measuring less than 16 feet. Younger whales look blue-gray in color and then turn white by age five or six. Belugas are the only all-white whale”.

We were lucky enough to catch tiny glimpses of the white whales, raising their brows momentarily through the glacial silt like shooting stars in a turquoise sky.

We drove another half hour and came to the quaint town of Girdwood. The main attraction here is Aleyska resort.

Set amidst lush mountains, this area has many hiking trails and summerhouses of rich Alaskans. Mount Alyeska is part of the Chugach mountain range and the Alyeska Resort is the largest ski area in the state. This resort has several transporting systems to take travelers up towards the mountaintop. Of these, only the aerial tram was in operation this season due to COVID related issues. We took the ride and were blessed with a heavenly vista of the wide valley below.

Now we had to rush as we had a cruise booked in Portage Lake at noon. Our driver valiantly sped along the winding road while casting disapproving looks at us for not keeping on time. The 144-passenger boat MV Ptarmigan was blowing its horn as we ran down the jetty to its ramp.

Portage Glacier

On the cruise, we came to experience the stark, breathtaking face of a mighty Alaska glacier located within a couple of hours from Anchorage. During the cruise we came within 300 yards from this relic of the Ice Age. The elderly narrator made a brave effort to educate the passengers on the glacier, but we were too engrossed in the immediate visual delight.

From Portage, the highway veered sharp south and coursed through the mountains, offering dramatic views of wild Alaska. We reached the precincts of Seward in another 2 hours. Before entering the town, we deviated to a branching road towards Exit Glacier.

“Hello”, said Aishani, “will anyone tell me who made up these crazy names? Why would a glacier be called Exit?”

Aarit came to the rescue again.

“Hey Aishani, this glacier earned its name when mountaineers first crossing the Harding Icefield “exited” the ice at this Glacier. The 8-day journey took place in the spring of 1968, beginning in Homer and ending in Seward. With 700 square miles of ice, the Harding Icefield is the largest one in United States and one of four in the entire country”.

We took a steep 2.2 miles’ hike to a vantage point. Su started screaming that her heart and limbs will be at severe risk, but jovial Jason told her with an encouraging smile that her limbs have grown stronger already with the day’s activities. Moon, always helping others, found her a tree branch she could lean on as a cane. Signs along the trail dating back to 1800s, mark the extent of the glacier at various years. They clearly show the effect of climate change on glacial recession.

Seward is a picturesque port city which is also a harbor for cruise ships. It is situated at the head of Resurrection Bay on the Kenai Peninsula which is famous for fjords. The historic downtown district is known for its charming shops and restaurants. We basked in the gentle sun and enjoyed views of the brilliant blue waters.

Exit Glacier near Seward, AK

We voted against dining at the overcrowded restaurants from fear of COVID, and started back. The drive to Anchorage was uneventful, and everyone felt tired. The driver appeared upset that we did not have dinner and kept munching on health bars to express his distress.

The following morning, we took a flight to Fairbanks in Northern Alaska. On the way, the plane flew over snowclad peaks of Denali mountains. The captain of the aircraft swooped down really close to the peaks of the range and swerved to each by turn, to give passengers a close-up view. The view was stunning, but the proximity was a bit daunting.

Aishani was a somewhat scared and snuggled up to his father Jit for assurance. Jit asked Aarit what these mountains were called.

Aarit as usual, had done his homework.“This range was called Mount McKinley in the past, but the name was changed to Denali by local demand”.

“What does Denali mean?’ asked Aishani.

"It is derived from the word Deenaalee which in Koyukon language means the "high one", Aarit had the answer.

Aerial view of Denali Mountains

"Who is Koyukun?'

"The Koyukon are a people of Athabaskans Indians who live north of the mountain. The name was changed by Obama administration unilaterally against the will of Congress in 2015. And by the way, it is the tallest mountain in North America with an elevation of 20,310 feet. The name of the national park was also similarly changed but that was in 1980".

At Fairbanks Airport, we rented a minivan, grabbed an unpretentious lunch at Starbucks and started on our way to Denali Park.

In two hours, we reached our destination. The McKinley Chalet Resort turned out to be an upscale facility with Swiss style chalet type buildings connected by paved roads. Despite its sprawling setup with over 450 rooms, the woody surroundings gave the feel of seclusion and intimacy. We were assigned rooms in a building called Ridgeview. Each room had a private balcony looking out on spruce trees and gurgling brooks. The woody landscape with numerous Willows, Ferns, shrubs, and twittering birds was like a gentle symphony playing on our jaded senses. We had some snacks and headed out for dinner. Across the way, we came into Denali Square which had a collection of stores and eateries, and a central open amphitheater, The only restaurant that was open this season was Karsten's Public house named after the man who led the first expedition of Denali. It was famous for craft brews and authentic Alaska comfort foods. Outside seating was in the amphitheater with gas fueled firepits and a performer singing John Denver numbers. It was one of the most

memorable dinners we have ever had. The fragrant air, the fresh food, the glow of the fireside, and the lilting lyrics of Rocky Mountain High spun unreal charm for a few hours.

Next morning, we took the much acclaimed Tundra Wilderness tour. The 6 million acres Denali Park has only a gravel road inside it where private cars are not allowed. Only travelers taking organized tours can experience the sights and sounds. The trip was conducted by a naturalist guide cum driver with full narration. We stopped at several points that afforded good photo opportunities. Unfortunately, the tour was truncated from its scheduled 8.5 hours to only 4.5 hours as a landslide had closed part of the Park Road.

We had planned the following day to be pinnacle of our Alaska experience, and it turned out that way indeed. We left very early and drove to the airport in our rented van. We reported to the office of Northern Alaska Tour Company for a fly-drive tour beyond the Arctic Circle. We were checked onto a ten-seater plane and our bags were stuffed into its small hollow wings. A bold blue and white sign proclaimed this toy aircraft to be part of Arctic Airways. The pilot in his stentorian voice cried out a seat to each passenger based on his presumed body weight. Next, he handed out a pair of headphones to protect our ears from the engine noise and to be able to hear his instructions.

Denali Park

With a beating heart, we took off. The plane remained very steady and soon we could see the mighty Yukon River, and the legendary Alaska Pipeline on the ground. The pilot pointed out a small village called Stevens located on the north bank of Yukon.

Aishani was surprised. “How can people live by choice in such a desolate area with little communication to mainland, Uncle, and why is it called Stevens?”

Before I could open my mouth Aarit answered, “the village is named for its first chief, Skidedlestalk known as Old Steven. The population was 78 at the 2010 census”.

In about one and half hours we touched down at Coldfoot, located north of the Arctic Circle in the Brooks Mountain Range.

This time Jit took the lead and gave us some information, “Guys we are now roughly 174 miles northwards into the 414-mile Dalton Highway. In 2010 census, Coldfoot had only 10 residents. It is said that the place got its name in 1900, when gold seekers made it this far, got cold feet, and turned around. Today it serves as the northernmost truck stop in United States. It has a rustic inn, a dilapidated café, an airstrip and a gas station”.

We enjoyed our preordered lunches of sandwich and soda and bought some souvenirs.

Aerial view of Pipeline and Yukon RIver

Dalton Highway

Temperature was still mild at mid-50s. The low hills surrounding this lonely spot gave it a forlorn beauty.After we had rested and looked around, we started on the southbound tour back towards Fairbanks in a van. Now we were travelling along Dalton Highway which is one of Alaska’s most remote and challenging roads. Media claims it to be one of the most dangerous roads in the world, but I can assure you it is much better that many I have seen in

Alaska Pieline

other countries. Because of the underlying permafrost, the road could not be paved with asphalt and had to be made of beaten gravel.

Aishani who did not want to be superseded by his brother's knowledge, now exclaimed, "hey do you know this road is often called the Haul Road because it's mostly used by truckers moving cargo between the oil fields of Prudhoe Bay and Fairbanks. It is considered dangerous because of the fast trucks and potholes. And by the way, Prudhoe Bay is at the Arctic Ocean about 240 miles north."

Soon we stopped at the remarkable Trans-Alaska Pipeline. This is an engineering feat. Trans-Alaska Pipeline connects the oil fields of Prudhoe Bay in northern Alaska, with the harbor at Valdez, 800 miles to the south and has a diameter of 48 inches. It is the world's largest privately funded construction project built at a cost of $8 billion. It was built between 1975 and 1977, after the 1973 oil crisis when members of OPEC proclaimed an oil embargo for nations perceived as supporting Israel.

We reached the Arctic Circle in ceremonious fashion and received an official Arctic Circle Adventure Certificate.

This was at 66 degrees 33 minutes latitude. There was a signpost proclaiming the remarkable location, but it seemed rather mundane in this warm weather. Our next stop was at the shores of the mighty Yukon River, where we had burger and fries. After a brief halt, we drove down to a city called Joy near the Arctic Circle Trading Post. This is a designated spot for scanning the darkened skies for the Aurora. The location is 60 miles north of Fairbanks.

Yukon River in Arctic area

Jit was quick to set up his fancy Nikon camera on a tripod outside the log hut where we stopped. The hut had wood burning fireplace and a variety pf warm drinks like coffee and cider. Soon we saw that a dozen other travelers had set up their cameras and were gazing through their lenses at the dark Alaskan sky. Unfortunately, the sky was overcast with clouds and not a single star could be seen. We waited a couple of hours, but no aurora display was visible. With a heavy heart we started back towards Fairbanks at about 1.30 am. The day had been long, and our stomachs were full. The gentle tumbling of the wheels of our primitive vehicle on the gravel laden, pothole infested highway soon put us to sleep. We woke up with a start at about 2 am, with the driver screaming to us to get out of the bus. We thought we were on fire, so we all rushed out. We stood in a grassy clearing in the middle of a desolate landscape. What we saw when we looked up changed our lives forever. We saw flickering green flames playing across the wide skies like tongues of celestial torch lighting the way to heaven's pearly gates. We felt like puny terrestrial creatures who have suddenly been granted access to the Creator's universe. Our lives, our strifes, and our ambitions seemed to have reached fulfillment. I wanted to sing, like Tagore "I hear Your music chanting Your name throughout the skies and the stars".

We checked in at a riverside resort in Fairbanks in the early morning and had a good long sleep. We rested that day and took a boat cruise. The stately Discovery III boat had three decks with comfortable indoor seating, and a fourth top deck that was open-air. The large paddlewheel propelled the boat on its journey down the Chena River. The first demo was a bush plane on floats taking off alongside the boat, and banking in a long arc downstream. The next stop was an exuberant sled dog demo at the riverside kennels.

Chena Tribal Village

Upon reaching the confluence of the Chena and Tanana Rivers, we disembarked for a walking tour of a Chena Indian Village. Native Alaskan guides led groups to see spruce cabins, smokehouses, and crafts created by Athabascans natives.

Finally, we returned to our hotel, had a wonderful seafood dinner, and boarded the hotel shuttle to the airport.

Mesmerizing Northern Lights

Asish Mukherjee is a physician by profession; he loves writing, computers, and travel.

দুর্গা পুজোয় অসুর একজন বিপরীত শক্তি,ঠিক আলো আর অন্ধকারের মতো।

দশমীতে বাংলার বাইরে রাবণ পোড়ানো হয়, এমন কি মেদিনীপুর অঞ্চলেও এর প্রচলন আছে।

Drawing & script by Rajarshi Chattopadhyay

A disciple of the Government College of Art and Craft, Kolkata in 1996. his works developed into figurative and contemporary thoughts with the taste of fantasy.

His medium fits perfectly with his creation., he plays with black with colorful overtone. The rift between society and globalization is evident in his works.